মহান আল্লাহর নামে

যিনি পরম করুণাময় ও মহান দয়ালু

সন্তান: স্বপ্নের পরিচর্যা

ভাষান্তর	জিম তানভীর, মোদাসসের বিল্লাহ তিশাদ, সানজিদা শারমিন
সম্পাদনা	আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক
শার‘ই সম্পাদনা	ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী
পৃষ্ঠা সজ্জা	মাসুদ শরীফ
প্রচ্ছদ	মুহাম্মাদ শরীফুল আলম

সন্তান: স্বপ্নের পরিচর্যা

মির্জা ইয়াওয়ার বেইগ

SEAN
PUBLICATION

সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

সন্তান: স্বপ্নের পরিচর্যা

মির্জা ইয়াওয়ার বেইগ

© সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

প্রথম বাংলা সংস্করণ

যুল-কা'দা ১৪৩৮ হিজরি। অগাস্ট ২০১৭

পঞ্চম মুদ্রণ:

জুমাদা আল-উলা ১৪৪২ হিজরি। ডিসেম্বার ২০২০

ISBN: 978-984-33-6881-2

www.seanpublication.com

+88 01781183501

নির্ধারিত মূল্য: ১৩৫ টাকা।

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ যেকোনো উপায়েই হোক ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা, ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়। বইটির অনুমোদিত অনলাইন সংস্করণ কিনুন। কপিরাইটকৃত বই বেআইনিভাবে কিনে চৌর্যবৃত্তিকে উৎসাহিত করবেন না। ধন্যবাদ।

'Shontan: Shopner Porichorja'-Bengali version of Raising a Muslim Child by Mirza Yawar Baig, translated by Zim Tanvir, Modasser Billah Tishad and Sanjida Sharmin, edited by Abu Tasmiya Ahmed Rafique, reviewed by Dr. Manzur-E-Elahi, published by Sean Publication Limited of Bangladesh.

সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

২য় তলা, ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।

+ ৮৮ ০১৭৫ ৩৩ ৪৪ ৮১১

ইসলামে গ্রন্থস্বত্বের বিধান

গ্রন্থস্বত্ব ইসলামি শারী'আহ কর্তৃক সংরক্ষিত একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। ইসলাম প্রত্যেক লেখকের রচিত সকল রচনাকে তার ব্যক্তিগত সম্পদ বলে ঘোষণা করেছে এবং এতদসংশ্লিষ্ট সার্বিক অধিকারও তার জন্য সংরক্ষণ করেছে। পাশাপাশি কেউ যেন গ্রন্থস্বত্ব আইন লঙ্ঘন করে তার সে অধিকার হরণ কিংবা রহিত করতে না পারে, সে নিশ্চয়তাও বিধান করেছে। ইসলামি শারী'আতের সকল দলিল-প্রমাণ ও মূলনীতি সে প্রমাণই বহন করছে।

গ্রন্থ রচনা গ্রন্থকারের নিজেরই বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রমের ফসল ও অর্জন। এ অর্জন একান্তভাবে তাঁরই। তাঁর অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ কোনোভাবেই তাঁর এ সম্পদ ব্যবহার করতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

« কোন মুসলিম ব্যক্তির সম্পদ সে নিজে খুশিমনে প্রদান না করলে কারো জন্য কোনোভাবেই তা হালাল হবে না। » [সাহীহ্ আল-জামি' আস-সাগীর, হাদীস নং ৭৬৬২]

অতএব গ্রন্থকারের অনুমতি ছাড়া তার রচিত গ্রন্থ হতে আংশিক বা পূর্ণ কপি করা, ছাপানো ও তা বেচাকেনা করা ইসলামি শারী'আতে নিষিদ্ধ ও হারাম; কেননা তা অন্যায় উপার্জন ও ভক্ষণের শামিল। আল্লাহ ﷻ বলেন,

"...তোমরা পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না।" [আল-বাকারাহ, ২:১৮৮]

অধিকন্তু এটা শারী'আতের সীমালঙ্ঘন বলে গণ্য হবে বিধায় শারী'আতের নিষিদ্ধ কাজেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ ﷻ বলেন,

"...তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না; কেননা আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।" [আল-মা'ইদাহ, ৫:৮৭]

সূচি

দু'টি কথা ১০

ভূমিকা ১২

ইসলামের ধারক ও বাহক হিসেবে সন্তানের পরিচয় ১৮

সীমা নির্ধারণ করা ২২

ইঁদুর বনাম বিড়াল ২৭

সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় ৩৭

আল্লাহর সাথে সম্পর্ক: তাওহীদ ও উবুদিয়্যাহ ৪০

সার্বিক উন্নয়নে বিনিয়োগ ৪৪

আল্লাহ কে? ৫২

ভয় না ভালোবাসা? ৫৬

নবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর সাথে সম্পর্ক ৬২

রাসূল ও উম্মাহ সম্পর্কে বাচ্চাদের সচেতনতা ৮৪

শিশুরা চোখ দিয়ে শোনে ৮৬

আল্লাহর অফুরন্ত ভাণ্ডারের সন্ধান: সালাহ ও দু'আ ৯১

দান ও দা'ওয়াহ: মানবতার প্রতি অবদান রাখা ৯৩

সম্পাদকের কথা

বিখ্যাত বিজ্ঞানী আলফ্রেড নোবেলের নাম জানে না এমন শিক্ষিত মানুষ আজকাল পাওয়া ভার। কেননা, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান-গবেষণা, শান্তিসহ নানা বিষয়ে প্রতি বছর দেওয়া নোবেল প্রাইজকে বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে সম্মানজনক প্রাইজ মনে করা হয়। এভাবেই নোবেল পুরস্কার প্রদানের মঞ্চের নিয়ন আলোর ঝলকে মি. নোবেলের অন্ধকার ইতিহাস আজ হারিয়ে গেছে অজানার গহ্বরে।

মি. নোবেলের প্রধান আগ্রহ ছিল বিস্ফোরক গবেষণায়। মানুষ মারার তৎকালীন সর্বাধুনিক কল—ডিনামাইট তারই আবিষ্কার। একের পর এক নানা রকম বিধ্বংসী বিস্ফোরক ও যন্ত্র আবিষ্কার করে তিনি অঢেল সম্পদের মালিক হন। এসব কাজে তিনি অনেক ঝুঁকিও নিয়েছেন। একবার এক কেমিক্যাল গবেষণার সময় দুর্ঘটনায় তার গবেষণাগারে বিস্ফোরণ ঘটে তা উড়ে যায়। তার ছোট ভাইসহ পাঁচজন নিহত হয় এবং তিনি নিজেও আহত হন। তিনি ছিলেন নিভৃতচারী, সঙ্গী-সাথী, স্ত্রী-পুত্রহীন নিসঙ্গ একাকী জীবনের এক রহস্যময়ী মানুষ। ১৮৮৮ সালে তার ভাই লুই মৃত্যুবরণ করলে ভুলক্রমে পত্র-পত্রিকায় খবর রটে যায় যে, মি. নোবেল মারা গিয়েছেন। মজার ব্যাপার হলো তিনি যখন জানতে পারলেন যে, তার মৃত্যুসংবাদ রটে গেছে তখন তিনি তার সম্পর্কে মানুষের মুল্যায়ন কী তা দেখার জন্য আরও ঘাপটি মেরে থাকলেন।

প্রচণ্ড প্রতাপশালী ক্ষমতাবান ব্যক্তি আলফ্রেড নোবেলের মৃত্যুর পর পত্র-পত্রিকায় তার ব্যপক সমালোচনা হলো। লেখা হলো, ‘তিনি ছিলেন এমন ব্যক্তি যিনি অন্যের মৃত্যুর মধ্য দিয়েই বিত্তের পাহাড় গড়েছেন।’ বলা হলো ‘তিনি ছিলেন সেই নিকৃষ্ট ব্যক্তি যিনি দ্রুততম সময়ের মধ্যে অধিক সংখ্যক মানুষ হত্যার উপায় আবিষ্কার করেছেন।’ এমন কি একটি ফ্রেঞ্চ পত্রিকা রিপোর্ট করল Le marchand de la mort est mort যার ইংরেজি অর্থ হলো the merchant of death is dead—মৃত্যুব্যাবসায়ীর মৃত্যু।

এসব রিপোর্ট দেখে তিনি তার মৃত্যুর পর ভালো কোনো লেগেসি রেখে যাওয়ার চিন্তা করেন। তিনি বিয়ে থা করেননি; সংসার ছিল না, সন্তানাদিও নেই। পৃথিবীকে তিনি উপহার দিয়েছেন মানুষ মারার কল। তাহলে কীভাবে তিনি ভালো লিগ্যাসি রাখবেন?

তিনি ছিলেন বেশ চতুর বুদ্ধির অধিকারী মানুষ। তাই উপায় বের করতে তার বেশি বেগ পেতে হলো না। তার আবিষ্কৃত সেই কলের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত লাশগুলোকে মোড়ানোর জন্য তিনি সুন্দর ডিজাইনের যে কফিনটি তৈরি করেন তারই নাম আজ নোবেল পুরস্কার। মানুষ ভেতরের ক্ষতবিক্ষত লাশের কথা ভুলে আজ কফিনের সৌন্দর্যের গুণগানে ব্যস্ত।

আহ! অর্থ! আজ অর্থ দিয়ে যেকোনো নোংরা কাজ করার লোক ভাড়া পাওয়া যায়। পশ্চিমা সভ্যতা কতই না মহান, মহৎ ও মানবতাবাদী। শান্তির এ মহান ফেরিওয়ালারা মানুষ মেরে কামাই করা অর্থ দিয়ে শান্তি-পুরস্কার দেয়।

আজ যারা নোবেল পুরস্কার পেয়ে গর্ববোধ করেন তাদের হাতে ডিনামাইটের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে নির্মম মৃত্যুর শিকার হওয়া মানুষের রক্তের দাগ লাগে কি না? ডিনামাইটে নিহত নিরপরাধ মানুষের আত্মার অভিশাপ তাদেরকে তাড়া করে কি না? কিংবা নোবেল প্রাইজকে একটি অভিশপ্ত প্রাইজ বলা যায় কি না সে আলোচনার জায়গা এটা নয়, অন্য কোথাও একদিন তা হবে ইনশা'আল্লাহ।

কে কেমন লিগ্যাসি নিয়ে গর্ববোধ করে তা নিয়ে জনে জনে বিস্তর তফাৎ থাকলেও, লিগ্যাসি রেখে যাওয়ার বাসনা মানুষের প্রকৃতিগত। আর তাই মানুষ যদি কোথাও বেড়াতেও যায়, সে চায় সেখানে তার কোনো চিহ্ন রেখে আসতে—অন্যরা এসে জানবে আমিও সেখানে গিয়েছিলাম একদিন। বনে বেড়াতে গেলে গাছের চামড়া কেটে নাম লিখে রাখে। কোরাল দ্বীপের বালিয়াড়িতে লিখে রাখে কোনো আদ্যাক্ষর। সমুদ্রের বেলাভূমিতে নাম লিখে রাখে, অথচ সে জানে একটু পরই জোয়ারের ঢেউ এসে তা মুছে দিয়ে যাবে। এই জীবনে পৃথিবী নামক এই গ্রহে বেড়াতে এসে এর গায়ে যেসব চিহ্ন আমরা রেখে যেতে পারি তার অন্যতম হলো আমাদের সন্তান।

পরকালে বিশ্বাসীদের কাছে বিষয়টিতে আরও নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। কেননা, এটা তাদের কাছে কেবল লিগ্যাসি রেখে যাওয়ার বিষয় নয়; বরং ওপারের জীবনে তাদের জন্য প্রত্যক্ষ বস্তুগতভাবে উপকৃত হওয়ার একটি মাধ্যম হলো সন্তান। যে তিনটি কাজ থেকে একজন মু'মিন মৃত্যুর পরও তার আখিরাতের অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট ট্রান্সফার করতে পারে এর একটি হলো নেক সন্তানের দু'আ। মনে রাখা চাই—'নেক সন্তান' এর দু'আ; ভাড়া করে আনা হুজুরের দু'আ নয়।

সামাজিক জীবনেও এর প্রভাব অত্যন্ত গভীর। সন্তানের মাধ্যমে পরকালে উপকৃত হওয়ার সুযোগ ও আশা পৃথিবীতে সুনাগরিক গড়ে তোলার যে বংশানুক্রমিক চক্র তৈরি করে, তা দুষ্কৃতকারীমুক্ত একটি সমাজ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় শক্ত নৈতিক ভিত্তি দাড় করিয়ে দেয়।

দুনিয়ার জীবনে মানুষ নানাভাবে নানারকম সুবিধা লাভ করে থাকে। কখনো নিজের কোনো রকম প্রচেষ্টা ছাড়াও অনেকে অনেক কিছু পেয়ে যায়। কিন্তু আখিরাতের জীবনে মানুষ নিজের প্রচেষ্টায় অর্জন করা ছাড়া কিছুই লাভ করতে পারবে না। লাইসা লিল ইনসানি ইল্লা মা সা'আ। সন্তান জন্মদান থেকে শুরু করে তাকে 'মানুষ' করার জন্য পিতা-মাতা যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন এটাই পরকালে তাদের জন্য এই সুবিধা প্রাপ্তির পথ তৈরি করে।

তাই সন্তান প্রতিপালনের ব্যাপারে, তাদেরকে সত্যিকার মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার ব্যাপারে বিশ্বাসী সম্প্রদায়কে অবশ্যই আরও বেশি যত্নবান হতে হবে।

আমাদের এ বইটি আমাদের সন্তান প্রতিপালন ও পরিচর্যা নিয়ে। লিখেছেন মির্জা ইয়াওয়ার বেগ। দুনিয়াকে তিনি ব্যবসায়ীর নির্মোহ চোখে দেখেছেন, ধর্মের নির্ভুল দণ্ডে ব্যবচ্ছেদ করেছেন। অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন, উপদেশ দিয়েছেন। কখনও কঠিনভাবে; কখনও কোমলভাবে। উভয়টাই আমাদের কল্যাণের জন্য—সেই জীবন ও এই জীবনের। আল্লাহ লেখককে উত্তম বিনিময় দিন, সিয়ান পাবলিকেশনের প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন!

আবু তাসমিয়াহ আহমদ রফিক

ahmedrafique1000@gmail.com

দু'টি কথা

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে 'শিশু প্রতিপালন' বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে আমি প্রথমেই বাবা-মা'দের একটি প্রশ্ন করতাম:

'আপনার জীবনের অনুকরণীয় আদর্শ কে? আপনাদের কতজনের কাছে আপনার আদর্শ ব্যক্তিত্ব হলেন আপনার বাবা কিংবা মা?'

সত্যি বলতে, শতকরা পাঁচ ভাগের বেশি ভূমিকা রেখেছেন ও মানুষের কাছে আমি এর কোনো ইতিবাচক উত্তর পাইনি। অর্থাৎ বাকি পঁচানব্বই ভাগ মানুষের আদর্শ ব্যক্তিত্ব তাদের বাবা-মা নন! অথচ এ বাবা-মায়েরাই তো তাদের প্রতিপালনে সবচেয়ে বেশি আত্মত্যাগ করেছেন! বিষয়টা সত্যিই দুঃখজনক। এমনটি কখনোই কাম্য নয়। তবে, পরিণামে এর দায়ভার কিন্তু আমাদের নিজেদেরই। আশা করি, আমার এ বইটি আপনাকে সে পঁচানব্বই ভাগ হতভাগ্য পিতা-মাতার দলভুক্ত হওয়া থেকে রেহাই দেবে ইনশা-আল্লাহ।

মুসলিম বিশ্বে কাজ করতে গিয়ে বারবারই আমি পিতা-মাতাদের একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি—'শিশুর প্রতিপালন কিভাবে করা উচিত?'

তরুণ বাবা-মায়েরা তাদের সন্তানদের সত্যিকার মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলার ব্যাপারে খুবই আগ্রহী থাকেন। তারা চান যেন, সন্তানরা তাদের নিজেদের এবং বাবা-মায়ের জন্য সম্মান বয়ে আনে। তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবের সংকলনই হলো আমার এ বইটি।

আমার মতে, সন্তান প্রতিপালন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। তাই পিতা-মাতার জন্য আবশ্যক হচ্ছে, নিজ দায়িত্ব পরিষ্কারভাবে বুঝে নিয়ে সচেতনভাবে তা পালন করা।

প্রত্যেক বাবা-মা'রই উচিত সন্তানের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ হওয়া। বাবা-মা'কে আদর্শ হিসেবে পাওয়া সন্তানের একটি অধিকার। শুধু পার্থিব শিক্ষা নয়;

বরং পরকালে সাফল্য লাভের উপায়ও তারা সন্তানদেরকে শিক্ষা দেবেন। এ দায়িত্বটাও তাদেরই।

আপনি চান আর না চান, আপনিই আপনার সন্তানের অনুকরণীয় আদর্শ। আপনি কেমন আদর্শ হতে চান, তা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে আপনার ওপরই। আপনি কি তাদের দৃষ্টিতে শ্রদ্ধার পাত্র হতে চান নাকি ঘৃণার, সে সিদ্ধান্ত আপনাকেই নিতে হবে। বাচ্চারা আপনাকে দেখছে প্রতিনিয়ত। আপনি সন্তানদের যত ভালো ভালো উপদেশই দেন না কেন, আপনি নিজে কী করেন, সেটাই তাদের অনুকরণের বিষয়। সন্তান থাকলে বাবা-মা'র ব্যক্তিগত জীবন বলে কিছু থাকে না। আপনি যা-ই করেন সবসময়ই তা বাচ্চাদের নজর কাড়বে। তারা আপনার প্রতিটি কাজকে পর্যবেক্ষণ করবে, শিখবে এবং অনুকরণ করবে। আপনার কথা এবং কাজে যদি অসামঞ্জস্য থাকে, তাহলে সন্তানের কাছে আপনি গ্রহণযোগ্যতা হারাবেন। আল্লাহ ﷻ আপনাকে পাঠিয়েছেন সন্তানের পথপ্রদর্শক হিসেবে। আর একারণেই ইসলামে পিতা-মাতাকে এত বেশি মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

আমি কামনা করি, এ বইয়ের পাঠকবৃন্দের সন্তান-সন্ততিরা যেন তাদের ইহকালীন জীবনের প্রশান্তি ও পরকালীন জীবনের অবিরত কল্যাণ লাভের উৎসে পরিণত হয়।

মির্জা ইয়াওয়ার বেইগ

ভূমিকা

> চামচে তুলে খাইয়ে দিলে, চামচের আকার-আকৃতি ছাড়া আর কিছুই শেখা হয় না।
>
> —ই.এম. ফরস্টার

মুসলিম বাবা-মা'দের একটি বড় রকমের ভ্রান্ত ধারণা আছে। তাদের অনেকেরই ধারণা, বাবা-মা হিসেবে তাদের দায়িত্ব অন্যান্য পিতা-মাতার মতোই—কেবল সন্তানের ভরণ-পোষণ করানো, স্কুলে পাঠানো আর তার সুন্দর ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করা। নিঃসন্দেহে সন্তানের প্রতি মুসলিম বাবা-মা'দের কিছু বিশেষ দায়িত্ব আছে; ঠিক যেমন আগেকার রাজ-রাজাদের যুগে, রাজপুত্র ও রাজকন্যাদের বিশেষ শিক্ষা দিয়ে ব্যতিক্রমীভাবে গড়ে তোলা হতো। সন্তানকে বিশেষ শিক্ষা দেয়া কোনো অযৌক্তিক দাম্ভিকতা নয়; বরং মুসলিম বাবা-মা হিসেবে নিজেদের বিশেষ দায়িত্বকে উপলব্ধি করে তা যথাযথভাবে পালন করার একটি পদক্ষেপ মাত্র।

অনেক মা-বাবাকে দেখেছি যারা জীবনে অনেক কঠোর পরিশ্রম করেছেন। এদের অনেকে অশ্রুসিক্ত আবেগ নিয়ে অনেক সময় বলেন, 'আমি চাই না, আমার সন্তান জীবনে কখনো আমার মতো কঠিন অবস্থার মুখোমুখি হোক।'

স্পষ্ট ভাষায় আপনাকে বলতে চাই, আপনি যা বলেছেন তার অর্থ হলো—'আমার সন্তানকে কখনো ধীর-স্থির, শক্ত-সমর্থ ও সাহসী হয়ে গড়ে ওঠতে দেব না; সফল হওয়ার যে যোগ্যতা ও সামর্থ্য আমার নিজের আছে, তা তাকে অর্জন করতে দেব না কখনোই!' আপনার এমন ন্যাকা আদরের ফলাফল এমনই হবে। কেননা যা আপনি বলেছেন তার পরিণতি আসলে এমনটাই দাঁড়াবে। আমার এ কথা শুনে অনেকেই ধাক্কা খায়। কারণ তারা কখনো বিষয়টাকে এভাবে ভেবে দেখেনি।

ব্যক্তিগত অবদানের মূল্য নির্ধারণে মুসলিম সমাজ আজ অনেকটাই অক্ষম। তারা বুঝে না যে, কেবল পূর্বসূরিদের কাঁধে ভর দিয়ে জীবন পার করে দেওয়ায় কোনো সার্থকতা নেই। প্রত্যেক প্রজন্মেরই রচনা করা চাই নিজস্ব এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। এ যুগে অমুসলিম শিশুর মতো একটি মুসলিম শিশুকেও দেওয়া হয় একই শিক্ষা। মুসলিম হিসেবে বিশেষ দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেওয়ার জন্য তাদেরকে প্রস্তুত করা হয় না। আমি বলছি না—বাচ্চাদের মধ্যে অহংকার বা বর্ণভেদ তৈরী করুন। আমি সকলকে একটি সত্য মনে রাখতে বলছি। আর তা হলো, জন্মসূত্রেই এ মুসলিম শিশুদের ওপর বর্তায় এক গুরুদায়িত্ব। তাই বাবা-মায়ের উচিত তাদেরকে এ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে গড়ে তোলা এবং তা পালনের জন্য প্রস্তুত করা। কেননা, এব্যাপারে আল্লাহ ﷻ-র কাছে আপনাদের জবাবদিহি করতে হবে।

মানুষ সাধারণত দাম দিয়ে কোনো কিছুর গুণগত মানের বিচার করে। তাই বাচ্চার শিক্ষার পেছনে তারা অকৃপণভবে অর্থ-সম্পদ ঢেলে দেয়। এভাবেই তারা জীবনের বাস্তবতা থেকে সন্তানকে দূরে সরিয়ে রাখে। পরিণতিতে এ সন্তান কখনোই জীবন-যুদ্ধে লড়তে শেখে না। বাবা-মা বাচ্চাকে সবচেয়ে দামি খেলনা কিনে দিতে সচেষ্ট থাকে। অথচ তারা বুঝে না যে, এভাবেই তার সন্তান মানুষকে নিছক বস্তুগত দৃষ্টিতে মাপতে শিখতে শুরু করে। তার মনে গেঁথে যায়—সে-ই 'উত্তম' শিশু! কারণ, তার আছে দামি দামি খেলনা। এমন বাবা-মা সন্তানকে অতি যত্নে দরিদ্রতা ও অভাব থেকে আড়াল করে রাখে। এভাবেই শিশুর মনে অতি মহৎ ও দুঃসাধ্য লক্ষ্য অর্জনের তাড়না ও আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হওয়া থেকে সেসব বাবা-মা তাদেরকে 'সুরক্ষিত' করে রখে! তারা প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সন্তান ও সেসব মানুষের মাঝে, যাদের সাথে লেনদেনে যেতে হবে শিক্ষা জীবন শেষ হওয়ার পরপরই। একদিন তাদের সাথেই কাজ করতে হবে সন্তানটিকে। তারাই হয়ে যাবে তার জীবনের অংশ এবং তার জীবন তাদের দ্বারাই পরিবেষ্টিত থাকবে। আপনার সন্তানকে হয়তো কখনো কখনো অন্যকে অনুপ্রেরণা দিতে হবে, দিতে হবে নেতৃত্ব, নিতে হবে কারও যত্ন অথবা কাউকে সমর্থন যোগাতে হবে। কেবল জনহিতকর কাজের ক্ষেত্রে নয়, বরং চারপাশের এসব মানুষকে অবশ্যই বুঝতে হবে। কেননা আপনার সন্তানের ব্যক্তি জীবনের লক্ষ্য অর্জন ও সফলতা লাভ অনেকাংশে নির্ভর করে

এসব মানুষের উন্নয়নে কাজ করার মাঝে। মা-বাবারা ভুলে যান যে, এই ছোট্ট তুলতুলে শিশু একদিন পৃথিবী নামক বাস্তব কঠিন পরিবেশে পা বাড়াবে; অথচ সেখানে লড়াই করে নিজে টিকে থাকার মতো কোনো কিছুই তার কাছে নেই; অন্যদের নেতৃত্ব দেওয়া তো দূরের কথা।

একটি সন্তানকে শুধু খাইয়ে-পরিয়ে বড় করলেই দায়িত্ব শেষ হয় না। পোষা প্রাণীর ক্ষেত্রে আপনি এমনটি করেন; তবে সন্তানের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট নয়। একটি শিশুকে আদর-যত্ন-ভালোবাসা দিয়ে লালন-পালন করতে হয়। সমাজে তার স্থান সম্পর্কে ধারণা দিতে হয়। সাফল্য লাভের উপায়গুলো শিখিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি তাকে তার দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করতে হয়। প্রতিটি শিশুকেই এ বিষয়গুলো শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন; তবে মুসলিম শিশুদের জন্য এর প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি। মুসলিম শিশুদের শিক্ষার ধরন ও তাদের অর্জিত অভিজ্ঞতা হতে হবে অন্যদের চেয়ে ভিন্নতর। সমাজের আর দশ জনের মতো নয় বরং অন্যভাবে নিজেদেরকে মূল্যায়ন করতে শেখাতে হবে তাদেরকে। শৈশব থেকেই শিশুর মাথায় এ বিষয়গুলো ঢুকিয়ে দিতে হবে। একজন মানুষ ধনী না গরীব সেটা তার সম্পদের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে না। বরং নির্ভর করে তার চিন্তা-চেতনার ওপর। এ শিক্ষাগুলোই হতে পারে সন্তানের জন্য মুসলিম বাবা-মায়ের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। তবে খুব স্বল্পসংখ্যক বাবা-মা'ই সন্তানদের এ সম্পদ দিতে পারেন।

ব্যাপারটি বোঝার জন্য আমরা প্রতিভা বিকাশমূলক শিক্ষা-ব্যবস্থা থেকে উদাহরণ গ্রহণ করতে পারি। এ ব্যবস্থায় শৈশব থেকেই কোনো বিষয়ে বিশেষ প্রতিভার অধিকারী শিশুদের প্রতিপালনে বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়। আর সবার মতো এদের একই শিক্ষা দেওয়া হয় না। তাদের সকল শিক্ষারই মূল লক্ষ্য থাকে প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটানো; যেন ভবিষ্যতে সে ভূমিকা পালনের জন্য তারা উপযুক্ত হয়ে গড়ে ওঠতে পারে। এভাবে প্রতিপালন করলেই কেবল তাদের প্রতিভার যথার্থ বিকাশ ঘটতে পারে। টেনিস কিংবদন্তী অ্যান্ড্রি অ্যাগাসির উদাহরণটি চিন্তা করে দেখুন। তার বাবা চেয়েছিলেন, তিনি পৃথিবীর সেরা টেনিস প্লেয়ার হবেন এবং শৈশব থেকেই লক্ষ্য পূরণের কথা বিবেচনায় রেখে সেভাবে সন্তানকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। তিনি তার স্বল্প আয়ের একটা বড় অংশ

ব্যয় করেছেন বাড়ির আঙ্গিনায় টেনিস কোর্ট নির্মাণে। এরপর তিনি এমন এক বল নিক্ষেপণ মেশিন বানান যা ঘন্টায় একশ দশ মাইল বেগে বল ছুড়তে পারতো। এটা ছিল ১৯৭০ দশকের কথা। এত দ্রুত বেগে বল ছুড়তে পারে এমন কোনো যন্ত্র তখন বাজারে পাওয়া যেত না। কিন্তু সন্তানের জন্য তিনি সর্বোৎকৃষ্টটাই চেয়েছিলেন। তাই রূপান্তরিত ইঞ্জিন দিয়ে তিনি নিজেই তা তৈরি করে নিয়েছিলেন। যখন অ্যাগাসি টেনিস র‍্যাকেট হাত দিয়ে ধরার মতো একটু বড় হলো, তখন থেকেই তিনি সন্তানকে ট্রেনিং দিতে শুরু করেন। মাত্র সাত বছরের মাথায় অ্যাগাসি প্রতিদিন ঘন্টায় একশ দশ মাইল বেগে ছুটে আসা আড়াই হাজার বলকে পানির ওপাশে ছুড়ে দিতেন। আপনি যদি অংক কষে দেখেন, তবে এর সংখ্যা দাঁড়াবে বছরে এক মিলিয়ন বল। আজ অ্যাগাসি ক্রীড়া জগতের 'বিনিয়োগের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিদানকারী' হিসেবে খ্যাত। প্রতিদিন ঘন্টায় একশ দশ মাইল বেগে ছুটে আসা আড়াই হাজার বল ছুড়ে দেওয়া নিঃসন্দেহে সাত বছরের এক বালকের জন্য ছিল কঠোর প্রশিক্ষণ।

মুসলিম বাবা-মা'র ঘরে পাঠানোর মাধ্যমে একটি শিশুকে বিশেষ নি'মাহ্ দেওয়া হয় যা দ্বারা সে শৈশব থেকেই আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। অন্য সবকিছুর মতো এ নি'মাহ্র সঠিক ব্যবহারও বাচ্চাকে শিখিয়ে দিতে হয়। মনে রাখবেন, সে কোনো সাধারণ শিশু নয়। তাই তার সাথে অন্য সবার মতো আচরণ করার মানে তার প্রতিভাকে নষ্ট করা, দুনিয়ার বুকে তার কৃতিত্বকে রচিত করার সুযোগ থেকে তাকে বঞ্চিত করা। তার জন্য যে কাজটি করা অপেক্ষাকৃতভাবে সহজ ছিল, সে একই কাজ অন্যদের জন্য অনেক বেশি কষ্টসাধ্য। তাই গোটা পৃথিবীকে নেতৃত্ব দেওয়ার চূড়ান্ত লক্ষ্যকে মাথায় রেখে তাকে গড়ে তোলা উচিত। ছোটবেলা থেকেই তার ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং সযত্ন লালন-পালনের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত করা প্রয়োজন। তাকে ক্রমান্বয়ে কঠিন থেকে কঠিনতর কাজে অভ্যস্ত করানো উচিত; যেন সফলতার ধাপগুলো নিজে নিজে পার হওয়ার দক্ষতা সে অর্জন করতে পারে। তাকে বিভিন্ন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে দেওয়া উচিত; যেন সে নিজের ভয়-ভীতিকে জয় করতে পারে।

সন্তানকে সাহায্য করুন; কিন্তু তার হয়ে কাজগুলো করে দেবেন না। পরামর্শ দিন; তার ওপর সবকিছু চাপিয়ে দেবেন না। নিজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা

তাকে দিন। তবে তার ভিত্তি যেন হয় পারস্পরিক বিশ্বাস, সম্মান, ন্যায়নিষ্ঠতা, দায়িত্বশীলতা, জবাবদিহিতা এবং সর্বোপরি আল্লাহর সন্তুষ্টি। সমাজের দুঃস্থ অসহায় মানুষের কষ্টগুলো তাকে অন্তর দিয়ে অনুভব করতে দিন। অন্যের দুঃখে ব্যথিত হতে শেখান। তাদের জন্য তাকে নিজের চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরাতে দিন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও সামাজিক শ্রেণীবিভাগ নির্বিশেষে তাকে সকল মানুষের সাথে বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক গড়ে তুলতে দিন। আপনি শুধু খেয়াল রাখবেন—সে যেন সীমালংঘন না করে।

সন্তানদের শেখান—দরিদ্র মানেই অসম্মানিত নয়। ঠিক যেমনিভাবে ধন-সম্পদ থাকলেই সম্মানিত হওয়া যায় না। সন্তানকে বুঝান যে, নৈতিকতা ব্যক্তির মন-মনন, চিন্তাধারা ও বিচার-বিবেচনার সাথে সম্পর্কিত একটি বিষয়। লোক দেখানো কাজের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই; বরং ব্যক্তির সত্তার সাথে এর সম্পর্ক। আমার কাজকর্মই আমার পরিচয় বহন করে। আর আমি যা করি, একসময় সেটাই আমার পরিচয় হয়ে দাঁড়ায়। তাই মুসলিম সন্তানদেরকে শেখানো উচিত যে, আমাদের কৃতকর্মের মধ্যেই আমাদের পরিচয় নিহিত। কর্মকাণ্ডের ওপরে ভিত্তি করেই মানুষ তাকে মূল্যায়ন করবে, মানুষের প্রতি তার অবদানগুলোই তাকে সম্মান এনে দিবে। আমাদের কী ছিল, তার কারণে মানুষ আমাদের স্মৃতিতে জায়গা দেয় না; বরং অন্যের প্রতি আমাদের অবদানের কারণেই তারা আমাদেরকে স্মরণে রাখে। মানব কল্যাণে কাজ করার মানসিকতা যদি শৈশব থেকেই তার মাঝে গড়ে ওঠে, তখনই কেবল সে ভোগবাদী সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিকূলে যুদ্ধ করে বেড়ে ওঠতে পারবে। আর আমরা যদি আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা ও ভোগবাদী জীবনধারার সয়লাব রুখতে না পারি, তবে এক সময় এগুলোই আমাদের সবাইকে গ্রাস করতে শুরু করবে। সন্তানদের এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যেন তারা এ কুপ্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে এবং ভোগের পরিবর্তে আত্মত্যাগের চেতনায় বলীয়ান একটি সমাজ গড়ে তুলতে পারে। শুধুমাত্র তখনই আমরা একটি সুন্দর পৃথিবী রেখে যেতে পারব।

সন্তানকে ভোগের নেশায় মত্ত ও আত্মকেন্দ্রিক হিসেবে গড়ে তুললে, বড় হয়ে সে নিজের স্বার্থে পরিবারে ভাঙ্গন ধরাতে দ্বিধা বোধ করে না। আর সন্তানকে তার দায়িত্ব-কর্তব্যের ব্যাপারে সচেতন করা হলে, সে পরিবার ও

সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল ও যত্নবান হয়। ফলে বিশ্বের বহু মানুষের ওপর তার প্রভাব পড়ে, অনেকেই তার সেবা-যত্ন লাভে ধন্য হয়। আর এভাবেই সে আরও পরিণত, সমৃদ্ধশালী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব রূপে বিকশিত হয়। আমার মতে, সম্পদ ও ক্ষমতা এ দু'টি আল্লাহ মানুষকে দান করেন তার বুদ্ধিমত্তা ও কর্মের ফলস্বরূপ; যদিও এগুলো অর্জন তার মূল উদ্দেশ্য নয়।

আমি মনে করি, মুসলিমদের জন্য তাদের সন্তানদেরকে নিম্নোক্ত পাঁচটি মৌলিক বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া খুবই প্রয়োজন:

১. ইসলামের ধারক এবং বাহক হিসেবে তার পরিচয় প্রদান;
২. আল্লাহর সাথে সম্পর্ক—বিশেষত আল্লাহর একত্ববাদ ও তাওহীদুল ইবাদাহ;
৩. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সম্পর্ক—নবীর সুন্নাহ এবং তাঁর উম্মাহ হিসেবে তার পরিচয় দান;
৪. আল্লাহ ﷻ-র সাহায্য লাভের উপায়—সালাহ এবং দু'আ;
৫. দান এবং দা'ওয়াহ্‌র মাধ্যমে অসহায় মানুষের উপকার সাধন।

ইসলামের ধারক ও বাহক হিসেবে সন্তানের পরিচয়

আল্লাহ ﷻ বলেছেন,

‘তোমরাই হলে সর্বোত্তম জাতি, মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ দেবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।’ [আলে-ইমরান ৩:১১০]

তাই গোটা মানবজাতিকে নেতৃত্ব দিয়ে জান্নাতের পানে নিয়ে যাওয়ার চূড়ান্ত লক্ষ্য মাথায় রেখেই মুসলিম শিশুকে গড়ে তুলতে হবে। শৈশব থেকেই তাকে সতর্কভাবে দেখভাল এবং সযত্নে লালন-পালনের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত করতে হবে। এটিই হচ্ছে শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রকৃত অর্থ। ক্রমান্বয়ে কঠিন থেকে কঠিনতর কাজে তাকে অভ্যস্ত করানো উচিত; যেন সে নিজে নিজে সফলতা অর্জনের ধাপগুলো পার হতে শেখে। ভয়-ভীতির মুখোমুখি হয়ে তা জয় করার সুযোগ তাকে দিতে হবে।

তাকে সাহায্য করুন; কিন্তু সুরক্ষার প্রাচীর হয়ে দাঁড়াবেন না। পরামর্শ দিন; তবে সবকিছু তার ওপর চাপিয়ে দেবেন না। নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নেওয়ার স্বাধীনতাটুকু তাকে দিন। তবে খেয়াল রাখবেন—তার কাজকর্মের ভিত্তি যেন হয় পারস্পরিক বিশ্বাস, সম্মানবোধ, ন্যায়নিষ্ঠতা, দায়িত্বশীলতা, জবাবদিহিতা এবং সর্বোপরি আল্লাহর সন্তুষ্টি। সমাজের দুঃস্থ অসহায় মানুষের কষ্টগুলো তাকে অন্তর দিয়ে অনুভব করতে দিন। অন্যের দুঃখে ব্যথিত হয়ে তার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরাতে দিন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এবং সামাজিক শ্রেণিবৈষম্যের উর্ধে উঠে সকল মানুষের সাথে তাকে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে দিন।

মূল পার্থক্য—আখলাক্ব

আল্লাহ ﷻ-র সাথে সন্তানের সম্পর্ক গড়ে দেওয়া ও তা ক্রমান্বয়ে সুদৃঢ় করাই বাবা-মায়ের প্রাথমিক দায়িত্ব। এ সম্পর্কই হলো সবরকম অকল্যাণ থেকে শিশুর সর্বোৎকৃষ্ট সুরক্ষা।

বাচ্চাকে অবশ্যই চারিত্রিক মাধুর্য তথা আখলাক্বের শিক্ষা দিতে হবে যেন তাকে অন্যদের থেকে আলাদা করা যায় এবং সে হয় এ সমাজে ইসলামের এক পতাকাবাহী ধারক। যাবতীয় সামাজিক সদাচরণ ও বিনম্রতার পাশাপাশি, একজন মুসলিম শিশুকে অবশ্যই সেসব গুণও শিক্ষা দিতে হবে যা স্বয়ং আল্লাহ ﷻ কুরআনে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

‘মুমিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই। অতএব, তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে, যেন তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও। মুমিনগণ কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। এবং কোনো নারী অপর নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাদের মন্দ নামে ডাকা গুনাহ। যারা এমন কাজ থেকে তাওবা করে না তারাই যালেম। মুমিনগণ, তোমরা বেশি বেশি অনুমান করা থেকে বেঁচে থাকো। নিশ্চয় কিছু অনুমান গুনাহ। এবং গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না। তোমাদের কেউ যেন কারও পেছনে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশ্‌ত খেতে পছন্দ করবে? বস্তুতঃ তোমরা তো একে ঘৃণাই করো। আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।’ [আল হুজুরাত ৪৯:১০-১২]

বয়োজ্যেষ্ঠ, শিক্ষক ও ছোট ভাই-বোনদের সাথে কথা বলার আদব বাচ্চাদের শেখাতে হবে। তাকে বোঝাতে হবে যে, ধন-সম্পদ নয় বরং সুশিক্ষা ও উত্তম চরিত্রই মূলত সম্মানের চাবিকাঠি। তাকে জানাতে হবে, তার আচরণ দিয়েই সবাই তাকে মূল্যায়ন করবে। অন্যদেরকে শ্রদ্ধা করতে দেখলে মানুষ বুঝতে পারবে, এ সন্তান সঠিক শিক্ষা পেয়ে বেড়ে ওঠছে এবং তা তার পিতা-মাতার জন্যও সম্মান বয়ে আনবে। অন্যদিকে মানুষকে অশ্রদ্ধা করলে সবাই মনে করবে, সন্তানটি বাবা-মায়ের কাছ থেকে কোনো আদব-কায়দাই শেখেনি। কাউকে অসম্মান করলে সে ব্যক্তির মান-মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না, বরং যে অসম্মান করল তার হীনতাই প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

এখন মানুষ পরস্পরের কুশলাদি পর্যন্ত জানতে আগ্রহী নয়। এমনকি কাউকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, 'কেমন আছেন?' সে শুধু কর্কশ স্বরে বলে, 'ভালো আছি'। একটু হাসিমুখে পাল্টা জিজ্ঞেস করে না যে, 'আপনি কেমন আছেন? আপনার পরিবারের সবাই কেমন আছে?' এমনকি অনুমতি না নিয়েই অন্যের জিনিস ব্যবহার করাটাও আজকাল স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে। অন্যের পায়ে পাড়া দিয়ে, ধাক্কা লাগিয়ে হাত থেকে জিনিসপত্র ফেলে দিয়ে কিংবা মুখের সামনে হাঁচি দিয়ে 'দুঃখিত' না বলে চলে যাওয়াটাও এখন খুব স্বাভাবিক। একটা সময় মুসলিম সন্তানদের তাদের শিষ্টাচারের কারণে আলাদাভাবে চেনা যেত। তবে এখন আর সে দিন নেই। আল্লাহ আমাদের তাওফিক দিন যেন সে সোনালী দিনগুলো আবার ফিরিয়ে আনতে পারি।

খাবারের সময়সূচীর ব্যাপারেও বাচ্চাদের একটা স্বচ্ছ ধারণা দিতে হবে। বাসাটা কোনো হোটেল নয় যে, কেউ চাইলেই যখন তখন খাবার পাবে। খাওয়ার সময়, বিশেষ করে যে সময় পুরো পরিবার একসাথে খেতে বসে তখন কোনোভাবেই অনুপস্থিত থাকা যাবে না। সপরিবারে খাওয়ার সময় বন্ধুদের সাথে ফোনে গল্প করা যাবে না। সন্তানকে জানিয়ে দিতে হবে যে, বাড়িতে সে কোনো মেহমান নিয়ে এলে তাকেও বাসার নিয়ম মেনেই চলতে হবে।

স্বাভাবিকভাবেই বাবা-মায়েরা সন্তানদের অনুকরণীয় আদর্শ। তাই বাবা যদি অনিয়ম করে, তাহলে সন্তানও তা-ই করবে। বাবা যদি প্রিয় দলের খেলা দেখার জন্য টিভির সামনে বসে খেতে চায়, তখন অন্যরাও তার দেখাদেখি টিভির সাথে চোখ সেঁটে খাওয়া-দাওয়া করবে। এটাই একসময় রেওয়াজ হয়ে যাবে। তখন এর ব্যতিক্রম রীতি করার কর্তৃত্ব সে বাবার আর থাকবে না। বাবা-মা যদি চেয়ারে বসে বসে কাজের লোককে ধমকের সুরে এটা সেটা আনতে বলে, তাহলে বাচ্চারাও তা-ই করবে। বাবা-মা নিজেরাই যদি ঘর নোংরা করে, তাহলে বাচ্চারাও এর ব্যতিক্রম করবে না।

বাবা-মা'র উচিত বাচ্চাকে সাথে নিয়ে নিজেদের কাজ নিজেরাই সেরে ফেলা। তারা যদি টাকার বিনিময়ে অন্যকে দিয়ে নিজেদের কাজ করায়, তাহলে বাচ্চা মনে করবে, কিছু টাকা ছুড়ে দিয়েই গরীব লোককে দিয়ে সব কাজ করিয়ে নেওয়া যায়। অলসতা তাকে পেয়ে বসবে এবং সে চারপাশকে পরিষ্কার-

পরিচ্ছন্ন রাখার কোনো প্রয়োজন বোধ করবে না। নিজের ঘর-দোরকে গুছিয়ে পরিপাটি করে রাখা তো শিখবেই না; বরং এ কাজকে সে অসম্মানজনক মনে করবে। যারা নিজেরা এসব করে তাদেরকেও অবহেলার চোখে দেখবে।

উল্লিখিত আচার-আচরণগুলোর জন্ম আমাদের সমাজে প্রচলিত কুপ্রথা থেকে। এটা এমন এক সমাজ-ব্যবস্থা যেখানে মানুষের শ্রেণিবিন্যাস করা হয় অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে; জ্ঞান, নৈতিকতা কিংবা আখলাকের কারণে মানুষকে মূল্যায়ন করা হয় না। সমাজে কেউ অন্যের জন্য ভাবে না। প্রবৃত্তির পূজা করা এবং ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকাটাই যেন চূড়ান্ত লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে। আল্লাহর বিধি-নিষেধ অমান্যকারীর কোনো বিচার এ সমাজে নেই; বরং এসবের তোয়াক্কা না করে নিজের খেয়ালখুশি মতো যাচ্ছেতাই করে বেড়ানোকেই এ সমাজে ব্যক্তি স্বাধীনতা বলে আখ্যায়িত করা হয়।

শিশুদের শেখাতে হবে যে, ইসলাম নিছক কিছু ইবাদাত আর আচার-প্রথা নয়। বরং ইসলাম হচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, যেখানে আল্লাহ ﷻ ও অন্যান্য মানুষের প্রতি আমাদের দায়িত্ব কর্তব্যগুলো সুস্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে। কুরআনে এসেছে,

‘নিঃসন্দেহে ঈমানদারগণ সফলতা লাভ করেছে, যারা নিজেদের সালাতে বিনয়-নম্র। যারা অনর্থক কথা-বার্তা থেকে দূরে থাকে। যারা যাকাত আদায় করে থাকে। এবং যারা নিজেদের লজ্জাস্থানকে হিফাজত করে। তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ছাড়া। অতঃপর কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা সীমালংঘনকারী হবে। এবং যারা আমানত ও অঙ্গীকার সম্পর্কে সচেতন থাকে এবং যারা তাদের সালাতসমূহের ব্যাপারে যত্নবান হয়। এ লোকগুলোই হচ্ছে (মূলতঃ যমীনে আমার যথার্থ) উত্তরাধিকারী। জান্নাতুল ফিরদাউসের উত্তরাধিকারও এরা পাবে। তারা সেথায় চিরকাল থাকবে।’ [সূরা আল মু’মিনুন; ২৩: ১-১১]

এ গুণগুলো শিশুকে পৃথিবীর বুকে বিচরণকারী এক আদর্শ মুসলিমে পরিণত করবে। তাকে অন্যদের চেয়ে আলাদা করে তুলবে। ফলে সে হবে অন্যদের কাছে অনুকরণীয় আদর্শ।

এটাই ইসলামের মর্মকথা। রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর সাহাবাগণও আমাদের জন্য এ দৃষ্টান্তই রেখে গিয়েছেন। তারাই ছিলেন ইসলামের আদর্শনীয় মূর্ত

প্রতীক। তাই মুসলিম বাবা-মা'দের প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে নিজেদের জীবনে ইসলামের প্রতিফলন ঘটানোর মাধ্যমে সন্তানদেরকেও সেভাবে গড়ে তোলা।

সীমা নির্ধারণ করা

সন্তানের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট সীমা বজায় না রাখাটা পিতা-মাতার একটা মারাত্মক ভুল। বাবা-মায়ের অবশ্যই সন্তানের ওপর একটা কর্তৃত্ব থাকবে। আজকাল অনেক বাবা-মা'ই 'অভিভাবক' হওয়ার বদলে সন্তানের 'বন্ধু' হতে চান। আর তাই বাচ্চার প্রতি সদয় হতে গিয়ে তার সকল চাওয়া পূরণ করতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠেন। তখন এ সন্তান অভিভাবক ও বন্ধুর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে না। সবকিছুতেই বাবা-মা সন্তানের সাথে সমঝোতা করতে থাকে এবং সন্তানও তাদের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকে, যতক্ষণ না সে কাঙ্ক্ষিত জিনিসটি আদায় করে নিতে পারে। পরিণতিতে বাচ্চার চাওয়া-পাওয়ার সীমারেখা দিন দিন বাড়তেই থাকে। বাবা-মা'কে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, সন্তানের অনেক বন্ধু থাকতে পারে, কিন্তু বাবা-মা কেবল তারা দু'জনই। তারা সন্তানের অভিভাবক। বাবা-মায়ের ভূমিকা ছাড়া অন্য কোনো ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া তাদের জন্য আবশ্যক নয়। তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব হচ্ছে সন্তান প্রতিপালন এবং এটাই তাদের প্রথম এবং প্রধান কাজ।

বাচ্চারা কিন্তু সবসময়ই তাদের সীমারেখা যাচাই করে দেখে। তাই তার কাছে বিষয়টা স্পষ্ট থাকা বাঞ্ছনীয়। উদাহরণস্বরূপ, তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, শ্রদ্ধা ও যৌক্তিকতার সাথে সে বাবা-মা'র সাথে কোনো বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করতে পারে; কিন্তু আহ্লাদ বা বেয়াদবি নয়। সন্তানদের এসব আহ্লাদ বাবা-মা'র কাছে মোটেই পছন্দনীয় হওয়া উচিত নয়। বরং ক্ষেত্রবিশেষে তা অপমানজনক। তাকে বোঝাতে হবে, হাসি-তামাসা আর অপমান এক বিষয় নয়। স্পষ্টভাষী হওয়ার অর্থ হলো নিজের অধিকারের ওপর জোর দেওয়া; অন্যের অধিকার ক্ষুণ্ণ করা নয়। অন্যের অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে ঔদ্ধত্য। স্পষ্টভাষী হওয়া প্রশংসনীয়, আর উদ্ধত হওয়া নিন্দনীয়। নিজের ঘর, পড়ার টেবিল, বইপত্র, খেলনা, বাথরুম পরিপাটি করে রাখা এবং বাগান, পোষা প্রাণী প্রভৃতির পরিচর্যা

করা তার নিজের দায়িত্ব; বাবা-মা কিংবা কাজের লোকদের নয়। প্রয়োজনে কাজের লোক দিনে একবার ঘর পরিষ্কার করবে। বাচ্চারা সারাদিন ময়লা করবে আর তারা সারাক্ষণ পরিষ্কার করতেই থাকবে—এমনটি নয়। প্রাচ্যের ধনাঢ্য পরিবারগুলোর একটি অতি সাধারণ চিত্র হলো—সারাদিনই বাচ্চার পেছনে পেছনে মা কিংবা একটা কাজের লোক লেগে থাকে। বাচ্চা নোংরা করতে থাকে আর সে এটা সেটা তুলে ঘরবাড়ি পরিষ্কার করতে থাকে। এ বাচ্চাগুলো যেন একেকটা চলমান বর্জ্য তৈরীর কারখানা! বাচ্চাদের অবশ্যই শেখাতে হবে যে, বাসা কিংবা নিজের রুম বারবার এলোমেলো করাকে কিছুতেই মেনে নেওয়া হবে না। তাকে বোঝাতে হবে, রুমটি তার নিজের হলেও সেখানে যা খুশি তা করা যাবে না। সব জায়গায়ই নিয়ম মেনে চলতে হবে।

বাচ্চাদের বুঝিয়ে দিন, টাকা দিয়ে সবকিছুর মূল্যায়ন করা যায় না। যেমন, পড়াশুনার ব্যয় কম হতে পারে; কিন্তু জ্ঞানের মূল্য অপরিমেয়। তাই বিদ্বান দরিদ্র হলেও তাদেরকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করতে হবে। কাজ শেষে ঘরে ফেরার সাথে সাথে আপনার ছোট্ট সন্তানটি আপনাকে জড়িয়ে ধরতে গিয়ে আপনার দামী স্যুটে হয়তো তার ময়লা হাতের ছাপ বসিয়ে দেবে। কিন্তু আপনার স্যুটের চেয়ে সে আলিঙ্গানের মূল্য অনেক বেশি। তাই নীরব থেকে তাকে আরও নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরুন এবং বোনাস হিসেবে একটি চুমু দিন। আপনার স্যুটটি পরিষ্কার কিংবা পরিবর্তন করা যাবে। কিন্তু ছোট্ট শিশুটির হৃদয়কে ভাঙা হলে তা মুহূর্তের মধ্যে মেরামত করা যাবে না। বাচ্চাদের শেখাতে হবে যে, ইট-কাঠের যে খাঁচাটিতে তারা থাকে সেটা একটা বাড়ি মাত্র, নীড় নয়। একটা বাড়ি যত বড়ই হোক না কেন, কোথাও না কোথাও অবশ্যই এর চেয়েও বড়, উঁচু, প্রশস্ত এবং সুন্দর বাড়ি আছে। বাড়ির বাইরের চাকচিক্য সেখানকার বাসিন্দাদের সুখ-শান্তির পরিচায়ক নয়। নিয়ম-নীতি, সুখ আর পরিতৃপ্তিই পারে ইট-কাঠের একটা বাড়িকে শান্তির নীড়ে পরিণত করতে।

অর্থবিত্ত সম্পদ বাড়ায় না, বাড়ায় কেবল সম্পত্তি:

সন্তানকে মানুষের জন্য সম্পদ ব্যয় করতে শেখান। সম্পদের জন্য মানুষের ক্ষতি করতে শেখাবেন না। তাকে শেখান যে, তার খেলনাগুলো একদিন ভেঙে যাবে, কিন্তু খেলার সাথীর সাথে তার বন্ধুত্ব দিন দিন গভীর হবে। ।

বাচ্চাদের শেখাতে হবে যে, টাকা দিয়ে কেনা জিনিসের চেয়ে একজন মানুষের মূল্য অনেক বেশি। পোশাক-পরিচ্ছদ, আধুনিক প্রযুক্তি, সহায়-সম্পত্তি কিংবা বিলাসবহুল গাড়ি-বাড়ি কখনো একজন মানুষের মূল্যকে বৃদ্ধি করতে পারে না। তাই একজন বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ নিজের অর্থ বৃদ্ধির চিন্তা না করে, নিজের মূল্য বৃদ্ধি করতে চাইবে। যেসব লোক নিজেরা এ বিশ্বাস পোষণ করে এবং অন্যদের ওপরও চাপিয়ে দেয় যে, অর্থ-সম্পদই মানুষের মর্যাদার মাপকাঠি—তাদের নিজেদেরই আসলে কোনো মূল্য নেই। নিজেদের আত্মমর্যাদাবোধ খুব কম বলেই তারা মানুষকে অবমূল্যায়নের চেষ্টা করে। সন্তানকে জানিয়ে দিন, কারও যত দামি গাড়ি-বাড়িই থাকুক না কেন, তা তার মর্যাদার প্রতীক নয়। শুধুমাত্র স্বল্পবুদ্ধির মানুষই এসব ক্ষণস্থায়ী জিনিসের পেছনে অঢেল টাকা ঢালতে পারে।

আপনি পোশাক পরেন, জুতা পায়ে দিয়ে চলাফেরা করেন, সময় জানার জন্য হাতে ঘড়ি পরেন। কিন্তু এগুলোর কোনোটাই আপনার পরিচয় বহন করে না। আপনি কেমন মানুষ তার কোনো ইঙ্গিতই এগুলো থেকে পাওয়া যায় না। আপনার সম্পত্তি নয়; বরং আপনার চরিত্র, কাজকর্ম, নীতি ও মূল্যবোধই আপনার পরিচয় বহন করে। আপনার সম্পত্তি চুরি হয়ে যেতে পারে বা কেউ আপনার কাছ থেকে সেগুলো কেড়ে নিতে পারে। কিন্তু আপনার চরিত্র, মূল্যবোধ আর নৈতিকতা মানুষের মনে এমনভাবে প্রোথিত হয়ে থাকবে যা মুছে ফেলা সম্ভব নয়। আপনার কৃতকর্ম অনুযায়ী মানুষ আপনাকে হয় শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে, নতুবা ঘৃণার সাথে। এমনভাবে জীবনযাপন করুন যেন অন্যরা আপনাকে সম্মানের সাথে দেখে। নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে বাচ্চাদের এ বিষয়গুলো শিক্ষা দিন। কারণ নিজে করে দেখানোই তাদেরকে শেখানোর সর্বোত্তম পন্থা।

সন্তানদের অবশ্যই অর্থ-সম্পদের গুরুত্ব সঠিকভাবে বোঝাতে হবে। অর্থ উপার্জন এবং বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করার মূল্যও তাকে শেখাতে হবে। ব্যয় ও বিনিয়োগের মধ্যকার পার্থক্য তাকে ধরিয়ে দিতে হবে। সম্পদ বিনষ্টকারী নয়; বরং সম্পদের প্রবৃদ্ধি সাধনের প্রশিক্ষণ তাকে দিতে হবে। তাকে শেখাতে হবে—ব্যয় করার ফলে সম্পদ শুধু হ্রাস পায়; অপরপক্ষে,

বিনিয়োগ করা হলে এর বিনিময়ে অনেক বেশি কিছু পাওয়া যায়। কেবল নির্বোধ লোকেরাই সম্পদ যথাযথভাবে ব্যবহার করতে জানে না, অনর্থক টাকা 'ব্যয়' করে। পক্ষান্তরে, বুদ্ধিমান অর্থের বিনিয়োগ করে আরও সম্পদশালী হয়ে ওঠে এবং অন্যদেরকে সাহায্য-সহায়তা করার পাশাপাশি সে নিজের আখিরাতকেও সুন্দর করে গড়ে তোলে। আপনার সন্তানকে 'ব্যয়' ও 'বিনিয়োগের' এ মানদণ্ডে সম্পদের ব্যবহারকে বিচার করতে শেখান। তাকে দেখিয়ে দিন, মানুষ কীভাবে বিলাসবহুল গাড়ি, বাড়ি, অলঙ্কার আর কাপড়-চোপড়ের পেছনে কত সম্পদ 'ব্যয়' করছে! খেলাধুলা ও বিনোদনের পেছনে কত টাকা অপচয় করছে। অথচ বই-পত্র কেনা, অন্যদেরকে সাহায্য করা এবং অনুরূপ ভালো ভালো কাজে খুব কম সম্পদই তারা 'বিনিয়োগ' করে।

লেনদেনের মাধ্যমেই সন্তান টাকা-পয়সার সঠিক ব্যবহার শিখবে। তাই তাকে হাত খরচ দিন। পাশাপাশি তাকে হিসাব ও ব্যালান্স শিট তৈরি করে দেখাতে বলুন। সে কোন্ খাতে ব্যয় করছে তা লক্ষ্য করুন। খেয়াল রাখুন, সে কি বিনিয়োগ করছে, নাকি শুধুই ব্যয়ই করে যাচ্ছে? তাকে সম্ভাব্য বিনিয়োগের খাতগুলো দেখিয়ে দিন। বাচ্চা কেবল ভোগবিলাসে টাকা না উড়িয়ে তা বিনিয়োগ করতে শিখলে তবেই আপনার প্রচেষ্টা সফল হবে। খেয়াল করুন, সে মানুষের কল্যাণে টাকা খরচ করছে কি না। একই সাথে নিজেও কল্যাণমূলক কাজে বিনিয়োগ করার মাধ্যমে সন্তানকে উৎসাহ দিন। এজন্য আপনার অঢেল সম্পত্তি থাকা আবশ্যক নয়। আগেই বলেছি, ধন-সম্পদের পরিমাণের ওপর নয় বরং আপনার চিন্তা-চেতনার ওপরই নির্ভর করে আপনি ধনী না গরীব।

সন্তানকে আখিরাতের জন্য ব্যালান্স শিট তৈরি করতে শেখান। তাকে শেখান যে, পৃথিবীতে রেখে যাওয়া সম্পদের জন্য আল্লাহর কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। আর আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যা ব্যয় করে তার জন্য সে আল্লাহর কাছে পুরস্কৃত হবে। আপনার ব্যালান্স শিটটিও তাকে দেখান। মনে রাখবেন, বাচ্চারা কিন্তু চোখ দিয়ে শোনে এবং যা দেখছে তা-ই শিখবে।

আমাদের নিত্যদিনের কাজকর্মের মধ্য দিয়ে আজ আমরা অর্থ-বিত্তে পরিপূর্ণ একটি সমাজ গড়ে তুলতে সফল হয়েছি বটে, কিন্তু মনের দিক থেকে আমরা রয়ে গেছি একেবারেই কাঙাল। আমাদের সামান্য সম্পদ অন্যের সাথে

ভাগাভাগি করে নেওয়ার মানসিকতা আমাদের নেই। তাই তো ক্ষুধা আর দারিদ্র্য আমাদেরকে ঘিরে রেখেছে। আমাদের সমাজ প্রাচুর্যের দিক থেকে সমৃদ্ধ হলেও নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সহমর্মিতার দিক থেকে নিতান্তই কাঙাল। তাই পাপ আর অপরাধের সাথে আমাদের নিত্য বসবাস। এ সমাজ তথ্যে পরিপূর্ণ এক বিশাল ভাণ্ডার, কিন্তু এ যেন শান্তিহীন, প্রজ্ঞাহীন এক 'তলাবিহীন ঝুড়ি'। এ কারণেই বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে 'শিক্ষিত' জাতিগুলোই সবচেয়ে 'বর্বর'। পৃথিবীর কত মানুষ খাদ্যের অভাবে মরে যাচ্ছে; অথচ ২০০৭-৮ সালে শুধু ব্রিটেনেই এক বিলিয়ন পাউন্ড মূল্যের খাবার ফেলে দেওয়া হয়েছে! এটা কি খাদ্য উৎপাদনজনিত কোনো সমস্যা? নাকি আমাদের সহমর্মিতার অভাব?

আমাদের এ সমাজে ক্ষমতা ও সম্পদ এমন কিছু মুষ্টিমেয় লোকের হাতে পুঞ্জীভূত, যারা অন্যকে নিয়ে কখনো ভাবে না। এদের কাছে এত বেশি সম্পদ রয়েছে যে, তারা চাইলেই ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত একটি শিক্ষিত শান্তির বিশ্ব তৈরি করতে পারে, যেখানে সকলে স্বাস্থ্যসেবাও পাবে। যেখানে থাকবে না কোনো উদ্বাস্তু বা অপরাধী। কিন্তু এর পরিবর্তে তারা মারণাস্ত্র বানিয়ে এমন এক পৃথিবী তৈরি করছে যেটা এত বেশি ক্ষমতাধর যে, নিজেকেই নিজে ৪০ বার সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে সক্ষম। অথচ তারা চিন্তা করে দেখে না যে, একবার সম্পূর্ণ ধ্বংস করার পর দ্বিতীয়বার ধ্বংস করার সুযোগ তারা কীভাবে পাবে! আর বাকি ৩৮ বারের কথা তো ছেড়েই দিলাম।

সংশোধন শুরু করতে হবে নিজের ঘর থেকেই:

আত্মকেন্দ্রিক চিন্তা-চেতনা থেকেই আমাদের সমাজে উৎপত্তি লাভ করেছে 'ইঁদুর দৌড়ের' ধারণা। ইঁদুর দৌড়ের সমস্যাটি হচ্ছে, জিতলেও দিনশেষে আপনি কিন্তু একটি ইঁদুরই থাকবেন। তাই এ সম্পর্কিত কিছু মতামত এখানে উল্লেখ করে বিষয়টি সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।

একবার এক বন্ধু আমার কাছে এ ইঁদুর দৌড় থেকে বের হওয়ার উপায় জানতে চায়। আমি তৎক্ষণাৎ বলে ফেলি, 'বিড়াল হয়ে যাও।' এরপর আমি নিজেই কিছুক্ষণ চিন্তা করি যে, ইঁদুর ও বিড়ালের মধ্যে পার্থক্য কী? এ পার্থক্য কিভাবে আমাদেরকে উন্নত ও পরিতৃপ্ত জীবন লাভে সাহায্য করতে পারে?

এটি কেবল একটি উপমা মাত্র। এখানে যে উন্নত জীবন ও প্রশান্তির কথা বলা হয়েছে তা পুরোটাই মানুষের জন্য। ইঁদুর বা বিড়ালের জন্য নয়। তবে, এ উপমার মধ্যেই মানুষের জন্য অনেক শিক্ষা রয়েছে। এখানে সে বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করা হচ্ছে। দয়া করে সত্যি সত্যি ইঁদুর-বিড়াল নিয়ে না ভেবে এ উপমা থেকে মানুষ হিসেবে কীভাবে আমরা নিজেদের জীবনকে উন্নত করতে পারবো সে চিন্তা-ভাবনা করুন।

ইঁদুর বনাম বিড়াল

ইঁদুর আর বিড়ালের মধ্যে এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য কোন্‌টি? আমার মতে, ছুটতে থাকা ইঁদুর আর বিছানায় শুয়ে থাকা সে দৌড়-ঝাঁপ উপভোগ করা বিড়ালটির মধ্যে মূল পার্থক্য হলো মনোযোগ।

ইঁদুর দৌড়ের মূলে আছে শুধু আত্মম্ভরিতা আর ধ্বংসাত্মক প্রতিযোগিতা:

এ দৌড়ে অন্যের সাথে সার্বক্ষণিক নিজের তুলনা চলতে থাকে। এর ফলে কেউই তার নিজের অবস্থান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে না; বরং অন্যকে হারিয়ে দিতে আরও কঠোর পরিশ্রম করা শুরু করে। স্বাভাবিকভাবেই, তাদের মধ্যে জন্ম হয় লোক দেখানোর মানসিকতা। কারণ তাদের মনে হয়, অন্যরা যদি না-ই দেখে তাহলে আর এত কিছু অর্জন করার অর্থ কী? ফলে নিজের ঢের থাকলেও তাদের মন ভরতে চায় না; বরং অন্যের চেয়ে বেশি থাকলেই কেবল তারা আত্মতৃপ্তি লাভ করে। তাই সবার যদি সমপরিমাণ সম্পদ থাকে বা প্রত্যেকের অবস্থাই যদি ভালো হতে থাকে, তাহলেও তারা সন্তুষ্ট নয়। অর্থাৎ প্রাচুর্য নয়; বরং বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের চেয়ে 'বেশি বেশি' থাকাটাই তাদের সুখী হওয়ার সূত্র। সম্পদের প্রাচুর্য দেখিয়ে অন্যদের হতাশ ও ঈর্ষান্বিত করতে পারার মধ্যেই তারা সুখ খুঁজে পায়। যেহেতু বস্তুগত জিনিস পুঞ্জীভূত করা ও মানুষকে দেখানো তুলনামূলকভাবে সহজ, তাই ইঁদুর দৌড়ের পুরো বিষয়টাই বৈষয়িক। ভালোবাসা ও মমতায় পরিপূর্ণ একটি শান্তির নীড় বানানোর বদলে তারা অহঙ্কারে পরিপূর্ণ অট্টালিকা নির্মাণ করে। আর সে অট্টালিকায় তারা ঠেসে ঠেসে ভরছে আগের যুগের 'ইঁদুর'দের সঞ্চিত ভাণ্ডার। আর সে আগের

যুগের ‘ইঁদুর’গুলোও এ জিনিসগুলো নিয়ে এসেছিল তারও আগের প্রজন্মের ইঁদুরের বাড়ি থেকে!

কী অদ্ভুত! এ পরিহাসটুকুও মানুষ চিন্তা করে দেখে না। এদের গাড়ি চলাচলের জন্য নয়; বরং সামাজিক অবস্থান দেখানোর একটি সাইনবোর্ড। এদের বিয়ে নবদম্পতির নতুন জীবনের সূচনা নয়; বরং তাদের বাবা-মা’দের সম্পদ প্রদর্শনীর একটি উপলক্ষ মাত্র। অন্যেরা অনেক আগ্রহ নিয়ে এসব বিয়েতে যায়। কিন্তু সেখানে ভূড়িভোজ করেও তাদের ক্ষুধা-পিপাসা মেটে না। হাঁ করে তাকিয়ে থাকে বিয়ের জাঁকজমক দেখে। এমন আয়োজন করার সাধ্য না থাকায়, তারা আমন্ত্রণকারীর অপব্যয় ও অনুষ্ঠানটির ত্রুটি-বিচ্যুতি কদর্যতা নিয়ে নানা অভিযোগ তুলে নিজেকে প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা করে। বন্ধু-বান্ধবের খুশি ভাগাভাগি করে নেওয়া নয়, বরং এদের অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় পরস্পরকে ঈর্ষান্বিত করা। তাই অন্য কাউকে গয়না দিয়ে মোড়া দেখলে, নিজের সুন্দর জামা বা অলঙ্কারটি পরার মিষ্টি ভালোলাগাটুকু নিমিষেই বিলীন হয়ে যায়।

ইঁদুর দৌড়ের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, অন্যের দুঃখ-দুর্দশায় ও দুর্ভাগ্যে খুশি হওয়া। কার বাড়ির স্বর্ণ-গয়না লুট হয়ে গেলো, সড়ক দুর্ঘটনায় কার বহু মূল্যবান গাড়ি দুমড়ে-মুচড়ে গেলো—এগুলোই যেন তাদের সবচেয়ে পছন্দের আলোচনা। যদিও তারা মায়াকান্না দেখায়; কিন্তু চোখের কোণের ঝিলিকই তাদের অন্তরের বদ্উচ্ছ্বাসকে প্রকাশ করে দেয়। এ ‘ইঁদুর সমাজ’ অত্যন্ত নির্মম। এখানে সবাই শুধু ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা চিন্তা করে। ন্যায়-অন্যায় নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই। কর্মপদ্ধতি ভালোখারাপ যা-ই হোক না কেন, সেটা কোনো বিবেচ্য বিষয় নয়। যে কোনো উপায়ে কার্যোদ্ধার করাটাই মূল লক্ষ্য। যে পদ্ধতিতে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল আসে, সেটাই তাদের দৃষ্টিতে ন্যায় হয়ে ওঠে। আমি অর্জন করেছি এটাই মুখ্য, কী উপায়ে তা করলাম সেটা গৌণ বিষয়। আর কিসের বিনিময়ে তা অর্জিত হলো সেটা তো আরও মূল্যহীন। অন্যের ওপর অন্যায় সুবিধা নেওয়ার জন্য মূল্যবোধ, সদাচরণ, নীতি ও ধর্মকে নিছক একেকটা মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এর কোনোটির প্রতিই এরা আন্তরিক নয়। যতদিন এগুলো কাজে লাগছে ততদিন ভাব-লেশহীনভাবে এগুলোকে

ব্যবহার করছে। আর যখন প্রয়োজন ফুরিয়ে যাচ্ছে তখন ছুড়ে ফেলে দিচ্ছে। দিনশেষে, এ স্বার্থপর সমাজে আরাধনা করা হয় শুধু ব্যক্তিগত কামনা-বাসনার।

ইঁদুর দৌড়ে জয়ী হওয়ার জন্য সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলা আবশ্যক। তাই এ ইঁদুরেরা ক্রমশ কৃপণ হয়ে ওঠে এবং সম্পদ জমা করতে শুরু করে। কমে যাওয়ার ভয়ে সামান্য পরিমাণ সম্পদও অন্যের সাথে ভাগাভাগি করতে রাজি না। এমনকি পচনশীল দ্রব্যও তারা জমা করে রাখে। সেগুলো নষ্ট হয়ে গেলেও অন্যকে তা দেয় না। অন্যেরা যেন কিছুতেই তাকে টপকে না যায় সে জন্য এ 'ইঁদুরেরা' তাদের জ্ঞানটুকুও কুক্ষিগত করে রাখে।

'ইঁদুরে' সমাজে শিক্ষার বড় অভাব। এখানে শিক্ষা ও সামর্থ্যের মধ্যে রয়েছে বিস্তর ব্যবধান। এ সমাজের মূল মন্ত্র হচ্ছে নিরাপত্তা। তাই ঝুঁকি নেওয়ার সাহস এদের নেই। সম্পত্তি হারানোর চিন্তা এদের মন-মগজকে আচ্ছন্ন করে রাখে এবং সম্পদ ধরে রাখার জন্য এদের কত রকম প্রয়াস! ইঁদুরেরা এ সহজ সত্যকে মেনে নিতে নারাজ যে, সমাজে বৈষম্য কমলে অপরাধ এমনিই কমে যাবে। তবে বৈষম্য দূর করতে হলে ধনী 'ইঁদুর'দের অবশ্যই অন্যদের সাথে তাদের সম্পদ ভাগাভাগি করতে হবে—আর এখানেই তাদের সকল আপত্তি। এ চিন্তাটাই 'ইঁদুর' চেতনার সাথে সাংঘর্ষিক। কারণ, এ চেতনার মূলে রয়েছে অন্যের চেয়ে বেশি সম্পদের অধিকারী হওয়ার আত্মতুষ্টিতে ভোগা। তাই এ বৈষম্যকে জিইয়ে রাখায় ইঁদুরে সমাজের একটা বিশেষ স্বার্থ নিহিত রয়েছে।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, অন্যের দিকে তাকিয়েও এরা এক ধরনের আত্মতুষ্টি লাভ করে। যখন অন্যদের চেয়ে আপনার বেশি অর্থ-সম্পদ থাকবে এবং সবাই আপনার দিকে ঈর্ষার চোখে তাকাবে, তখন আর পরিশ্রম করার প্রয়োজন নেই। পরিণতিতে এক পর্যায়ে কিছু সম্পদ জমা করার পর যখন সে দেখে যে, আশেপাশের সবার কাছেই সে ঈর্ষণীয় হয়ে ওঠেছে অথবা অঢেল সম্পদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা সে ব্যক্তির জন্য কঠিন হয়ে পড়ে; এ অবস্থায় তার কর্মোদ্যম হারিয়ে যায়। আর এভাবেই ব্যবসাটি মরে যেতে শুরু করে। শুধু অর্থ-বিত্ত নয়, ক্ষমতা বা জ্ঞানের ক্ষেত্রেও এদের অগ্রগতি থমকে যায়। কারণ এক্ষেত্রেও ইঁদুরেরা ঝুঁকি নিতে পছন্দ করে না। অথচ জ্ঞানের সীমাকে বিস্তৃত করতে ও অজানাকে জয় করার পন্থা খুঁজে বের করতে ঝুঁকি নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই।

নিজের সফলতা লাভের সামর্থ্য যাচাই করার জন্য ঝুঁকি নেওয়া অত্যাবশ্যক। তবে ঝুঁকির মাঝে সবসময়ই ব্যর্থ হওয়ার একটি আশঙ্কা থাকে। ইঁদুরেরা কিন্তু এ ব্যর্থতাকে বড্ড বেশি ভয় পায়। কারণ, এতে করে তাদের সম্পদ কমে যেতে পারে। তাই তারা ঝুঁকি নেওয়াকে অপছন্দ করে এবং সবসময় নিরাপত্তার বলয়ে অবস্থান করতে চায়। এভাবেই অগ্রগতি থমকে দাঁড়ায়।

এ সমাজে অন্যের ওপরে থাকাই পরিতৃপ্তির একমাত্র উৎস। এ কারণে ক্ষমতাশীল ইঁদুরেরা হয়ে উঠে অত্যাচারী স্বৈরাচারী। অন্যেরা তাদের সামনে মাথা নত করে থাকলে তারা সুখ অনুভব করে। স্বৈরাচারী ইঁদুরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকাটাই প্রধান গুণ হিসেবে বিবেচিত হয়। আর ক্ষমতাসীনদের কাছে জবাবদিহিতা চাওয়া হয়ে যায় মারাত্মক অপরাধ। সবাই নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে এবং এক সময় খেই হারিয়ে ফেলে। থাকে না তাদের কোনো লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। তখন রাষ্ট্রের জন্য শাসক নয়, বরং শাসকের জন্য রাষ্ট্র হয়ে যায়। শাসকের সাথে দ্বিমত পোষণ করাকেই বিরোধিতা বলে গণ্য করা হয় এবং বিরোধিতা করাকে দেশদ্রোহিতার সাথে তুলনা করা হয়। ফলে ইঁদুরে সমাজে সরকারের বিরোধিতাকে দেশেরই বিরোধিতা বলে ধরে নেওয়া হয়। এভাবে অর্থ-বিত্ত সঞ্চয় করে আপনি যদি ইঁদুর দৌড়ে জয়ীও হন, তবুও আপনি ইঁদুরই থেকে যাবেন। তাকিয়ে দেখুন, আপনার চারপাশে কতগুলো ইঁদুরকে আপনি চেনেন? আয়নায় যাকে দেখেন সে-ও কি তাদেরই একজন?

এখন দেখা যাক বিড়াল হওয়া বলতে কী বুঝায়

ইঁদুরের মতো বিড়ালও আত্মকেন্দ্রিক। তবে পার্থক্য হলো, সে নিজেকে শিকারী হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করে। বিড়াল কোনো কিছু জমা করে রাখে না। তাই প্রতিটি দিনই তাকে শিকার করতে হয়। ফলে দক্ষতা বৃদ্ধি, ভুল থেকে শিক্ষা লাভ, ঝুঁকি গ্রহণ এবং বহিঃশক্তির মোকাবেলায় নিজের ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ সে পায়। কোনোদিন শিকার করতে ব্যর্থ হলে তাকে ক্ষুধা পেট নিয়েই ঘুমোতে হয়। এটা তার শিকার করার প্রেরণাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। বিড়ালেরা শিকারের কৌশলগুলো তাদের শাবক ও দলের অন্যান্যদের শিখিয়ে দেয়। কারণ পুরো দলের অস্তিত্ব নির্ভর করছে তাদের সামগ্রিক দক্ষতার ওপর। সিংহের ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটে। বিড়ালেরা কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় থাকে

না। শিকার খুঁজতে তারা নানান জায়গায় যায়। ফলে তারা হয়ে ওঠে দূরদর্শী। তারা সফলভাবে শিকার করার জন্য নিত্য-নতুন কৌশল শেখে। তারা জানে, তাদের অস্তিত্ব তাদের পুরো দলের সার্বিক কল্যাণের সাথে সম্পর্কিত। তাই তারা একে অপরের যত্ন নেয়।

বিড়ালদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে নিজেদের উন্নয়ন সাধন ও পারস্পরিক সহযোগিতা করা

উল্লিখিত বিষয়গুলো থেকে আমি কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছি। আমার বিশ্বাস, কোনো মানুষ নিজের মধ্যে এ বৈশিষ্ট্যগুলো ধারণ করতে পারলে, সে হয়ে ওঠবে একজন সফল উদ্যোক্তা এবং সবদিক থেকে বিজয়ী। আমি নিচে সেগুলো বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। তবে এ গুণগুলো এমন যে, একটি থেকে অপরটি জন্ম নেয়। এভাবে বিড়ালে পরিণত হওয়া একটি জীবনব্যাপী আনন্দদায়ক পরিভ্রমণ স্বরূপ। কারণ এ বিড়ালেরা মৃত্যুবরণ করে না। তারা ঊষালগ্নে গভীর অরণ্য থেকে ওঠে আসা স্নিগ্ধ কুয়াশার মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

সাহসের ভিত্তি হচ্ছে বিশ্বাস

বিশ্বাস। ছোট্ট একটি শব্দ। কিন্তু এর গভীরতা অনেক ব্যাপক। এর অর্থ একেক মানুষের কাছে একেক রকম। তাই আমার কাছে 'বিশ্বাস'-এর অর্থ কী সেটা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। আমার মতে বিশ্বাস স্থির নয়; বরং এটা গতিশীল, যা ব্যক্তির শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক সামর্থ্যের ক্ষেত্রে তার নিজের সম্পর্কে উপলব্ধি। এ কারণেই নিজের সম্পর্কে সচেতনতা এবং নিজের আবেগকে বুঝতে পারাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এর ভিত্তিতেই সে ঝুঁকি নেয় এবং সফল হলে তার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়। আর ব্যর্থ হলে তা বিশ্লেষণ করে সে নতুন কর্মপন্থা উদ্ভাবন করে এবং সেটাও তার বিশ্বাসে নতুন মাত্রা যোগ করে। ব্যর্থতা কখনো কখনো আবার বিশ্বাসকে টলিয়ে দিতে পারে।

বিশ্বাস হচ্ছে নিজের সাফল্যের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া। নিজের করণীয় কাজগুলো ঠিকভাবে করে ফলাফল আশানুরূপ হবে এ আস্থা রাখার নাম হলো বিশ্বাস। কথাটা অযৌক্তিক শোনাতে পারে, কিন্তু সাফল্যের রেসিপিতে এ উপাদানটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সাফল্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলোর মধ্যে এটিই চূড়ান্ত। আর আপনার মধ্যে যদি বিশ্বাস না থাকে তাহলে আপনি একসময় সব শক্তি হারিয়ে ফেলবেন এবং চূড়ান্ত ধাপটিকে অতিক্রম করার কোনো অবলম্বনই আপনি পাবেন না। বারবারা উইন্টারস চমৎকারভাবে বিশ্বাসের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবেঃ

'চেনা জগতের শেষ সীমায় এসে অজানার অন্ধকারে পা-এ আস্থা নিয়ে পা বাড়ানো যে, আপনি অবশ্যই পায়ের নিচে মাটি খুঁজে পাবেন নতুবা আপনি উড়তে পারবেন। এ দু'টির যেকোনো একটি ঘটবেই—এ নিশ্চিত জ্ঞানই বিশ্বাস'।

আমার কাছে 'বিশ্বাস' হলো এ প্রত্যয় যে, কুরআনে আল্লাহ ﷻ যে অঙ্গীকারগুলো করেছেন তিনি অবশ্যই তা পূর্ণ করবেন। সূরা আত-তালাক্বে (আয়াত ২-৩) আল্লাহ বলেন:

'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য (সংকট থেকে বের হয়ে আসার) একটা পথ তৈরি করে দেন। এবং তিনি তাকে এমনভাবে রিয্ক দান করেন, যে

সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই ছিল না। যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তার জন্য আল্লাহ ﷻই যথেষ্ট।’

এ বিশ্বাসটিই আপনাকে সাহস যোগাবে। সবাই করতে পারে না—এমন কিছু করার সাহস, অত্যাচারীর সামনে সত্য বলার সাহস, মাজলুমের পক্ষে দাঁড়ানোর সাহস, প্রয়োজনে কঠিন কিছু করতে পারার সাহস, নিজের স্বপ্ন পূরণের সাহস। গভীর রাতে সবাই যখন ঘুমে নিমগ্ন তখন আপনি চিন্তায় নিবিষ্ট—আপনি যে পথে চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা কতটুকু যৌক্তিক। সে সময় এ বিশ্বাসই আপনাকে দীর্ঘ অন্ধকারাচ্ছন্ন পথের শেষ প্রান্তে আলোকচ্ছটা দেখাবে। প্রতিকূল অবস্থায় সচেতনতা আর প্রতিরোধ সর্বনিম্ন পর্যায়ে চলে গেলেও এ বিশ্বাসই আপনার হৃদয়ে জানান দেবে যে, আপনি ঠিক কাজটিই করছেন এবং আপনাকে এগিয়ে যাওয়ার সাহস যোগাবে।

সাহস ঝুঁকি নিতে সাহায্য করে

সাহসিকতার সাথে কাজ করলেই ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব হয়। কোনো কিছু শুরু করার আগে মানুষের মধ্যে সাহস থাকে না। প্রথম পদক্ষেপটি নেওয়ার পরই সাহসের সঞ্চার হয়। প্রথমে আপনার হৃৎস্পন্দন বেড়ে যাবে, হাঁটু কাঁপবে, গলা শুকিয়ে যাবে। কিন্তু এরপর যখন সবগুলো চোখ আপনার দিকে তাকিয়ে থাকবে, তখন সহসাই আপনি এক শীতল হাওয়ার পরশ পাবেন। মনে হবে, আপনার মেরুদণ্ড ইস্পাতদৃঢ় হয়ে ওঠেছে। আপনি মাথা উঁচু করে দাঁড়াবেন। আপনার বোধশক্তি আরও বেড়ে যাবে। আপনার চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠবে এবং কন্ঠস্বর হবে বলিষ্ঠ। নিজের কথা শুনে আপনি নিজেই অবাক হয়ে ভাববেন—এ কথা আমার ভেতর কোথায় লুকিয়ে ছিল! আপনি এমন কিছু ব্যাখ্যা করতে শুরু করবেন, যা আপনার কাছে এর আগে স্পষ্ট ছিল না। এমন সব উদাহরণ দিতে শুরু করবেন, যা শুনে মানুষ বিস্ময়ে বাহবা দিতে থাকবে। এমন মুহূর্তগুলো বারবার আসে না; কিন্তু যখন আসে তখন মানুষ তা সারাজীবন মনে রাখে। তাই পূর্বে যা আপনার কাছে ঝুঁকিপূর্ণ মনে হয়েছিল তা-ই যেন সহজ হয়ে ওঠবে। সাফল্য অবশ্যম্ভাবী হয়ে যাবে। আর এর মাঝেই আপনি পুরো ব্যাপারটির রোমাঞ্চ উপভোগ করবেন।

ঝুঁকির মধ্যে এক ধরনের রোমাঞ্চ আছে

শিরায় শিরায় 'এড্রেনালিন' নামক এক প্রকার হরমোনের স্রোতকেই রোমাঞ্চ বলা হয়। এ অনুভূতিটি কিন্তু এমন অনেক নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দেয়, যা ছিল এতদিন অব্যক্ত। যার অস্তিত্ব ছিল শুধু স্বপ্নেই। নতুন কোনো ধারণা যা জ্ঞানের সীমানায় ছায়া ফেলেছে মাত্র। ভবিষ্যতে যা ঘটতে পারে অথবা যা নিজেই হয়ে ওঠতে পারে ভবিষ্যৎ।

কল্পনা করুন, আপনি কোনো উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছেছেন। পুরো অভিযানটিই ছিল দুরূহ; কখনোবা ভয়ঙ্কর। কিন্তু আপনি তা অতিক্রম করেছেন। অবশেষে আপনি পাহাড়ের চূড়ায় পাথরের চৌকাঠ পেরিয়ে এক অজানা পৃথিবীতে পা রাখলেন। দুচোখের সীমানা জুড়ে দেখতে পেলেন সুবিস্তৃত উপত্যকা। এর পুরোটাই যেন আপনার পদতলে। সেখানে আছে ঢেউ খেলানো সবুজ ঘাস। অদূরেই হ্রদে বয়ে চলা ঝর্ণার পানির ছোঁয়ায় মাটি ধারণ করেছে নীলচে বর্ণ। এখানে সেখানে ছায়া বিছিয়ে রেখেছে সারি সারি গাছ আর তরুলতা। সেখান থেকে ভেসে আসছে লেজঝোলা টিয়েদের খুনসুটির কিচিরমিচির। আরও অনেক নাম না জানা পাখি এ গাছ থেকে ও গাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভোরবেলার জমে থাকা শিশির যেন কুয়াশার মতো আবছায়া জাল বুনে চারদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে। অজস্র সৌরভ, গুঞ্জন আর ছোট ছোট দৃশ্য যেন মনকে পাগল করে তুলছে। এমন সময় সেখান থেকে এক চিলতে শীতল হাওয়া আপনাকে স্বাগতম জানালো। আমন্ত্রণ জানালো লুকিয়ে থাকা আরও অজস্র সৌন্দর্য আবিষ্কার করার। বাকিটুকু কল্পনা করার দায়িত্ব আপনার ওপর ছেড়ে দিলাম। আপনার কল্পনা দিয়ে সেটি সাজিয়ে নিন।

শ্বাসরুদ্ধকর সে মুহূর্তটিকে উপভোগ করুন। উপভোগ করুন আপনার চোখের তারার ঔজ্জ্বল্য। আপনার গালে সূর্যের প্রথম আলোর উষ্ণ চুম্বন; বাতাসে ভেসে আসা বৃষ্টির আগমনী বার্তা। ঠাণ্ডা আর স্যাঁতসেঁতে বৃষ্টি নয়; বরং এটা সে জীবনদায়িনী বৃষ্টি যার জন্য ধরণী তৃষ্ণার্ত হয়ে দিনের পর দিন অপেক্ষা করে। এ রোমাঞ্চকর অনুভূতিই মানুষের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করে, তাকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও উদ্যমী করে তোলে। যদিও এ রোমাঞ্চের মধ্যেও এক ধরনের ভয় আছে, কিন্তু আশা করা যায় এর শেষটা শুভ হবে।

উত্তেজনা থেকেই উৎসাহের সৃষ্টি হয়

উত্তেজনার ডানায় ভর করেই তৈরি হয় কোনো কিছুর প্রতি প্রবল অনুরাগ। প্রবল উৎসাহ নিয়ে কাজ করলে সব দিক থেকেই কাজটি সহজ হয়ে যায়। ফলে অল্প পুঁজিতেই বিশাল কিছু করে ফেলা সম্ভব। এমনকি কাজটি শেষ করার সুযোগ দিতে সময়ও যেন ধীরে চলা শুরু করে। যেমন, ট্রেন হয়তো ঠিক সময়ে চলে এলো। তবে, ভুল করে গাড়িতে ফেলে আসা আপনার মূল্যবান জিনিসগুলোও ফেরত দিয়ে গেল ট্যাক্সি ড্রাইভার। এভাবে উৎসাহ আরও নতুন উৎসাহের জন্ম দেয়। প্রবল উৎসাহী ব্যক্তির সাথে কাজ করলে তার দেখাদেখি সহকর্মীরাও উৎসাহী হয়ে ওঠে। যে একঘেয়ে কাজটি তারা এতদিন যন্ত্রের মতো করে যাচ্ছিল, হঠাৎ করে তারা তাতে নতুন অর্থ খুঁজে পায়। বিশেষ ধরনের পরিতৃপ্তি লাভ করে এবং কাজের ব্যাপারে আরও আগ্রহী হয়ে ওঠে। তারা উৎসাহী নেতার সাথে আরও সময় কাটানোর প্রত্যাশা করে এবং তাকে খুশী করে এমন কাজ করার চেষ্টা করে।

তাই আমি মনে করি, প্রত্যেকেরই উচিত নিজের উৎসাহের বিষয়টি খুঁজে বের করা এবং সে বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করা। তখন আর কাজকে 'চাপ' মনে হবে না। কারণ, সে তার পছন্দের কাজটিই করছে। স্বাভাবিকভাবেই, আপনি যদি কোনো কিছুকে ভালোবাসেন এবং সেটি শেখেন, তাহলে তা ভালোভাবেই করার চেষ্টা করবেন। যে কাজটিকে কেবল চাকরি হিসেবে গ্রহণ করছে আর যে অন্তরের আকুতি থেকে করছে—তাদের দু'জনের কাজের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। কারণ, যে চাকরি হিসেবে করছে তার উদ্দেশ্য বড়জোর জীবিকা অর্জন। আর অন্যজনের জন্য তা হচ্ছে জীবনের লক্ষ্য পূরণ। এটা তার কাছে একটি অঙ্গীকার পূরণের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। আপনার প্রতিটি দিনই হতে পারে আনন্দ মুখর। কাজের প্রতি ভালোবাসাই আপনাকে এমন একটি জীবনের উপহার দিতে পারে।

প্রবল আগ্রহ উৎকর্ষের শীর্ষে পৌঁছে দেয়

স্বভাবতই কোনো কাজকে ভালোবাসলে সেটাকে সর্বোত্তম উপায়ে করার ইচ্ছে জাগে। এটাই হলো শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের গোপন রহস্য। লক্ষ্য অর্জনের জন্য আরও

উন্নত, লাভজনক, সুন্দর ও আনন্দদায়ক উপায় খুঁজে বের করার নিরন্তর চেষ্টাই আপনাকে সাফল্য এনে দেবে। এ আকাঙ্ক্ষার কারণেই আপনি এমন কিছু করবেন যা হয়তো বিশ্ববাসীর কাছে অদ্ভুত মনে হবে। অন্যেরা যেটুকু করা উচিত মনে করে তারচেয়ে বেশি যত্ন নেওয়া, অন্যরা যতুটুকু ঝুঁকি নেওয়া নিরাপদ মনে করে তারচেয়ে বেশি ঝুঁকি নেওয়া, অন্যেরা যতটুকু স্বপ্ন দেখার সাহস করে তারচেয়ে বড় স্বপ্ন দেখা এবং সর্বোপরি অন্যেরা যতটুকু চেষ্টা করে নিজের কাজে এর চেয়ে বেশি প্রচেষ্টা করার নামই শ্রেষ্ঠত্ব। শ্রেষ্ঠত্বের শিখরে ওঠার চেষ্টা থেকেই মানুষ নতুন নতুন আবিষ্কার এবং নতুন নতুন পন্থার সন্ধান পায়। এটা অন্যদের সাথে নয়; বরং নিজের সামর্থ্যের সাথে প্রতিযোগিতার বিষয়। এটা নিজের জ্ঞান, ক্ষমতা এবং প্রভাবের গণ্ডিকে প্রসারিত করার জন্য নিজের সাথে সামর্থ্যের প্রতিযোগিতা। শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের প্রচেষ্টাই মানুষকে সম্মান এনে দেয়, তার প্রতি অন্যেরা আকৃষ্ট হয় এবং তার প্রভাব বলয়কে প্রসারিত করে।

শ্রেষ্ঠত্ব থেকে ব্র্যান্ড উৎপত্তি

সাফল্যের সর্পিল গতিপথের চূড়ান্ত শিখর হচ্ছে অনন্যতা।

অনন্য হওয়ার প্রয়োজনীয়তা কী? অনন্যতাই আপনাকে স্বতন্ত্র পরিচয় এনে দেবে; গড়ে উঠবে ব্র্যান্ড। ব্র্যান্ডের প্রতি মানুষের অন্তরে আস্থা সৃষ্টি হয়। আস্থা মানুষের মাঝে একটি প্রভাব বলয় তৈরি করে, যা কিনা নেতৃত্বের মূল ভিত্তি। ব্র্যান্ড একটি স্বতন্ত্র পরিচয় এনে দেবে। ফলে মানুষের ভীড়ে আপনাকে আলাদা করে চেনা যাবে। আপনিই সাফল্যের নতুন মানদণ্ড হয়ে ওঠবেন, যার সাথে মানুষ অন্যদের তুলনা করবে। এটাই আপনাকে অন্ধকারের মাঝে আলোর দিশারী করে তুলবে, যা দেখে পথহারা পথিকেরা পথ খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করবে। অন্যান্য প্রতিযোগীদের চেয়ে আপনি মানের দিক থেকে এগিয়ে থাকলে আপনার অনেক বিশ্বস্ত ক্রেতা তৈরি হবে, যারা অন্যান্যদের চেয়ে আপনাকে অগ্রাধিকার দেবে। প্রত্যেক উৎপাদনকারীই তার পণ্যে ক্রেতাদের প্রয়োজন বুঝে এমন কিছু বিশেষত্ব যোগ করতে চায়, যেন তারা তার উৎপাদিত পণ্যকেই বেছে নেয়। মানবিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও এ একই যুক্তি প্রযোজ্য। শ্রেষ্ঠত্ব

অর্জনের ক্ষুধাই একজন মানুষকে এমন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করে তোলে যে, তিনি নিজেই আদর্শ হয়ে ওঠেন।

বিড়াল হওয়ার গূঢ়তত্ত্ব এটাই। অন্যেরা কী করছে তার পরোয়া না করে নিজের সর্বোচ্চটুকু করে যাওয়া। কেউ আপনাকে লক্ষ্য না করলেও নিজের সেরাটুকু ঢেলে দিন। অন্যেরা কী করছে বা করছে না সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করবেন না। বরং সাবলীল, উদার, মহানুভব, সম্মানজনক ও প্রজ্ঞাপূর্ণ আচরণ করুন। কারণ, আপনি আপনিই। আপনার আচরণই আপনার পরিচয় বহন করে। আর আপনার আচরণেই আপনার বিশ্বাস এবং মূল্যবোধ প্রতিফলিত হয়। আপনি যা করবেন তা-ই পাবেন আর আপনি আসলে তা-ই। আর সেটাই আপনার ইতিহাস হয়ে থাকবে। নিজের সেরাটুকু করতে পারাই সাফল্য। কারণ, কেবল ততটুকু করারই যোগ্যতা আপনার আছে। এ বার্তাকে জীবনে ধারণ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়

আমাদের জীবন সিদ্ধান্তে পরিপূর্ণ। সবসময়ই আমরা পরিবার, কর্মক্ষেত্র বা জীবনের অন্য কোনো না কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগতে থাকি। নিজেকে প্রশ্ন করতে থাকি 'করব কি করব না'? অথবা 'এ পথে যাব না ঐ পথে যাব'? দুটি বিকল্প রাস্তা খোলা থাকলে আমরা প্রায়ই চিন্তায় পড়ে যাই। ভাবতে থাকি—শেষ পর্যন্ত কোন্‌টা আমাদের জন্য বেশি ভালো হবে।

আমরা এমন এক পৃথিবীতে বাস করি যেখানে যেকোনো বিষয়ে দ্রুত তথ্য লাভ করা বেশ সহজ। সবক্ষেত্রে প্রযুক্তির প্রভাব আমাদের জীবনকে যুগপৎ সহজ ও জটিল করে তুলেছে। তথ্যের বাধভাঙা জোয়ার আমাদেরকে দিশেহারা করে দিচ্ছে। এর ফলে অনেকেই বুঝে ওঠতে পারে না, তারা কী পড়ছে বা দেখছে। ফলাফল? তথ্যকে যদি আমরা জ্ঞানের সাথে তুলনা করি, তবে আমাদের সমাজের অধিকাংশ মানুষই অজ্ঞ। এ বিপুল পরিমাণ তথ্য থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা বের করে নেওয়ার জন্য দরকারি উপকরণ বেশিরভাগ মানুষেরই নেই। তাই বাবা-মা'দের উচিত সন্তানদের এ উপকরণগুলোকে সজ্জিত করে তোলা।

আমি মনে করি, এর জন্য দুটি জিনিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ—সততা এবং ইতিহাস গড়ার ইচ্ছে-একাগ্রতা।

সততা

আমার মতে সততা হলো নিজের 'বিশ্বাস এবং মূল্যবোধের' ধারক ও বাহক হওয়ার সদিচ্ছা। এমনকি এর জন্য ব্যক্তি কাঠগড়ায় দাঁড়াতেও প্রস্তুত থাকে। তার মধ্যে এতটুকু আত্মবিশ্বাস আছে যে, তেমনটি করা হলেও তাকে কেউ টলাতে পারবে না। সততা হচ্ছে নিজের কাছে নিজে সৎ থাকা। ব্যক্তির বিশ্বাস, চিন্তা, কথা এবং কাজে সামঞ্জস্য থাকা, সে যা বিশ্বাস করে এবং যে ধ্যান-ধারণা মনে লালন করে সেটাকে জীবনে বাস্তবায়ন করা এবং লক্ষ্য অর্জনে একাগ্রচিত্ত থাকাই হচ্ছে সততা।

নিজেকে প্রশ্ন করুন, 'আমি কোন্ কাজের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকতে চাই?' নিজেকে বিবেকের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে কোনো অজুহাত ছাড়াই নিজের ভুলগুলো স্বীকার করে নেওয়ার সততা থাকা চাই। নিজের কথা, কাজ এবং সেগুলোর যেকোনো ফলাফলের জন্য দায়-দায়িত্ব নেওয়া এবং ভুলত্রুটি সংশোধন করার সদিচ্ছা থাকাও সততার অংশ।

ইতিহাস তৈরি করা

সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয়টি হচ্ছে, কাজটির স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ফলাফলগুলো বিচার করে দেখা। বর্তমান সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতে কী ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে, তা বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। আমাদের সবসময় স্মরণ রাখতে হবে যে, আমরা যা করি কিংবা যা করা থেকে বিরত থাকি তার জন্য আল্লাহর কাছে একদিন অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। যেকোনো কাজ করার আগে তার সম্ভাব্য ফলাফল বিশ্লেষণ করার ব্যাপারে বাচ্চাদের শিক্ষা দিন। যদিও আমরা ভবিষ্যতের জ্ঞান রাখি না, কিন্তু বিশ্লেষণের মাধ্যমে সম্ভাব্য অবস্থাগুলো সম্পর্কে আমরা ধারণা লাভ করতে পারি এবং বিচক্ষণভাবে সিদ্ধান্ত নিতে

পারি। তবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি ফলাফলের ওপর মনোযোগ দেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাৎক্ষণিকভাবে ভালো মনে হলেও দীর্ঘমেয়াদে ভয়ঙ্কর প্রভাব ফেলতে পারে এমন কাজ কোনোভাবেই করা যাবে না। আমরা দেখি যে, প্রায় প্রত্যেকটি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সমস্যার মূলে রয়েছে তাৎক্ষণিক লাভের আশায় গৃহীত অপরিণামদর্শী কিছু সিদ্ধান্ত। আমাদের মূল লক্ষ্য যদি হতো সম্মানজনক ইতিহাস নির্মাণ করা, তাহলে এ সমস্যাগুলোকে সহজেই এড়ানো যেত।

আল্লাহর সাথে সম্পর্ক: তাওহীদ ও উবুদিয়্যাহ

সন্তানকে অবশ্যই আল্লাহর পরিচয় দান করতে হবে। আল্লাহর মর্যাদা এবং মহিমার কথা বলতে হবে। আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্ককে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে। তাকে জানাতে হবে যে, বিচার দিবসে আল্লাহর কাছে প্রত্যেককে জবাবদিহি করতে হবে। তাকে বলতে হবে যে, আল্লাহ ﷻ আমাদের যা কিছু দিয়েছেন তার জন্য আমাদের উচিত আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া এবং তাঁর প্রতি আমাদের দায়িত্বগুলোকে যথাযথভাবে পালন করা। সন্তানদের অন্তরে তাওহীদুল 'উবুদিয়্যাহ' তথা আল্লাহর দাসত্ববোধের চেতনাকে এমন প্রগাঢ়ভাবে প্রোথিত করে দিতে হবে, যেন তার জীবনের প্রতিটি কাজকর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য হয় আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ। সন্তানকে আল্লাহর নাম, তাঁর কালাম এবং রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনী শুনিয়ে শুনিয়ে বড় করতে হবে। মুসলিম শিশুদের অবশ্যই তাদের দীনের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী এবং মুসলিম হিসেবে গর্বিত হতে হবে। তাদের অন্তর যেন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর ভালোবাসায় ভরপুর হয়ে ওঠে। তারা যেন বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্বের চেতনা নিয়ে উম্মাহর সদস্য হিসেবে বেড়ে ওঠে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। কুরআনে এসেছে,

'যদি আমি এ কোরআন পাহাড়ের ওপর অবতীর্ণ করতাম, তবে তুমি দেখতে যে, পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহ ﷻ-র ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছে। আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্য বর্ণনা করি, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে। তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই; তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যকে জানেন; তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা। তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, মাহাত্ম্যের একক অধিকারী। তারা যাকে অংশীদার করে আল্লাহ ﷻ তা থেকে পবিত্র। তিনিই আল্লাহ, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, উত্তম নামসমূহ তাঁরই। নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু

আছে, সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।' [সূরা আল হাশর; ৫৯:২১-২৪]

বয়স ও জ্ঞানে যারা বড়, তাদের সঙ্গে মেলামেশার একটি সুফল হলো তারবিয়্যাহ লাভ করা। বাচ্চাদের জন্য শিক্ষক প্রয়োজন। আমার প্রথম শিক্ষক ছিলেন আমার মা। আমার এখনও মনে পড়ে—পূর্ণিমা রাতে তিনি আমাকে হাত ধরে বাইরে নিয়ে যেতেন। আমরা আঙিনায় একসাথে বসে জোছনা দেখতাম।

উত্তর কানারার একটি ছোট্ট গ্রামে থাকতাম আমরা। গ্রামের নাম ছিল সিরসি। সেখানে বিদ্যুৎ ছিল না বললেই চলে। অধিকাংশ সময়েই আমাদের ঘরে বাতি বলতে ছিল কেবল কেরোসিনের কুপি। রাস্তায়ও কোনো লাইট ছিল না। কাছেই ছিল নিবিড় বন। চারদিকে ছিল ঘন কালো অন্ধকার। তাই পূর্ণিমার আলোর অপরূপ সৌন্দর্য পুরোপুরি উপভোগ করা যেত। মা আমাকে বলতেন, 'চাঁদটা দেখেছো খোকা? কী সুন্দর! তাই না? এটা আল্লাহর সৃষ্টি। সূর্যও আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। তাইতো আমরা চাঁদ-সূর্যের পূজো না করে আল্লাহর ইবাদাত করি।'

তখন আমার বয়স ছিল দু'বছর।

পাখি, ফুল, সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত, এমনকি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জিনিস দেখিয়েও মা আমাকে আল্লাহর মহিমার কথা মনে করিয়ে দিতেন। আগেও বলেছি, মা ছিলেন আমার প্রথম কুরআন শিক্ষক। তিনি আমাকে তাজওয়ীদের নিয়ম-কানুন শেখাননি, শুধু পড়তে শিখিয়েছিলেন। তবে তিনি ভালোভাবেই শিখিয়েছিলেন। আমি ক্লান্ত হওয়ার আগেই তিনি আমাকে ছেড়ে দিতেন। তাই আমি সবসময় পড়ার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকতাম। আমার বয়স ছয় হওয়ার আগেই আমি কুরআনে বর্ণিত সব নবীদের গল্প শুনে ফেলেছিলাম। নবীগণ আমার কাছে বাস্তব ছিলেন। গল্পের কোনো কাল্পনিক চরিত্র ছিলেন না। আমি শুধু তাদের কাহিনীগুলোই জানতাম না বরং তাদের জায়গায় নিজেকে বসিয়ে কল্পনা করতাম যে, আমি হলে কী করতাম। মা আমাকে এভাবেই শিখিয়েছিলেন। আল্লাহ, রাসুলুল্লাহ ﷺ এবং অন্যান্য নবী-রাসূল ছিলেন আমাদের দৈনন্দিন কথাবার্তার অংশ।

বাবা সালাতে আমাদের ইমামতি করতেন। মাসজিদ ছিল আমাদের বাড়ি থেকে অনেক দূরে। তাই আমরা সব ওয়াক্তের সালাত বাড়িতেই পড়তাম জামা'আত করে। আমি আযান দিতাম আর বাবা ইমামতি করতেন। তবে রমাদানে বাবার সাথে আমরা দু'ভাইও তারাওয়ীহ পড়তে মাসজিদে যেতাম। সেখানে ঠাণ্ডা পাথরের মেঝেতে একেবারে পাতলা একটা মাদুর বিছানো ছিল। আগে গেলে সেটাতে জায়গা পাওয়া যেত। নইলে সে ঠাণ্ডা মেঝেতেই পুরো সালাত আদায় করতে হতো। মাসজিদে শুধু একটা ছোট্ট বাল্ব টিমটিম করে জ্বলতো। আমরা আধো আলো আধো আঁধারে সালাত পড়তাম।

ইমাম চিরাচরিত উপমহাদেশীয় ভঙ্গিতে খুব দ্রুত কুরআন তিলাওয়াত করতেন। আমরা এক অক্ষরও বুঝতাম না। তবুও চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতাম। তখন আমার বয়স ছিল আট। আর আমার ভাইয়ের ছয়।

বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে আমরা আলিমদের ওয়াজ শুনতে যেতাম। আলোচনা শুরু হতো 'ঈশার সালাতের পর এবং প্রায় মধ্যরাত পর্যন্ত চলত। এ দীর্ঘ সময় ধরে আমরা চুপ করে বসে বক্তার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। আমাদের শরীরের উত্তাপে শীতল পাথুরে মেঝেও উষ্ণ হয়ে উঠত। তারপরও কোনোদিন না যাওয়ার জন্য ঘ্যানঘ্যান করিনি। বাবা যেতেন; তাই তার সাথে আমরা দু'ভাইও যেতাম।

অনেক বছর পরও এসব ওয়াজ মাহফিলে শোনা কথাগুলো বারবার আমার কানে বাজতো। আলোচিত বিষয় এবং সেগুলোর শিক্ষা আমি প্রায়ই মনে করতাম। বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর বাবার বন্ধুদের সাথে, কখনো বা বক্তার সাথে বসে চা খেতাম আমরা। আমাদের দু'ভাইয়ের কাজ ছিল সালাম দিয়ে চুপচাপ বসে থাকা। কিছু আনা-নেওয়া করতে হলে করতাম, নয়তো চুপ করে শুনতাম। জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে এ সময়গুলো যে আমাদের জন্য কত উপকারী ছিল তা বলে বোঝাতে পারব না। প্রথম প্রথম যা শুনতাম তার সবই মাথার ওপর দিয়ে যেত। কিন্তু ক্রমশ কথাগুলো বোঝা শুরু করলাম। এভাবে একটা সময় আমরা আমাদের বয়সের চেয়ে অনেক বেশি পরিণত দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করি, আলহামদু লিল্লাহ।

তাদের সেসব কথোপকথনের বিষয়বস্তুর পরিধি বিশ্ব রাজনীতি থেকে শুরু করে টেস্ট ক্রিকেট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্যালেস্টাইন নিয়ে তখনও কথা হতো। আমাদের রাজনীতিবিদদের ভাঁড়ামিও আলোচনা থেকে বাদ পড়তো না। আমার বাবার খুব ইচ্ছে ছিল প্যালেস্টাইনে গিয়ে তার চিকিৎসা পেশাকে কাজে লাগানোর। তিনি জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত আমাদেরকে প্যালেস্টাইনের ইতিহাস শোনাতেন। বাবা তাহাজ্জুদ পড়ে ফিলিস্তিনিদের জন্য দু'আ করতেন। আল আক্সার জন্য দু'আ করতেন। পরিবারের সবাই মিলে একত্রে বসে আমরা রেডিওতে খবর শুনতাম। বাবা দুটো রেডিও স্টেশনের ওপর খুব ভরসা করতেন—বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিস আর দি ভয়েস অব আমেরিকা। সে সময় হয়তো সাংবাদিকরা অনেকটা সত্য কথা বলতো। তখনও সাংবাদিকতা অধঃপতিত হয়ে আজকের মতো কর্পোরেট প্রচারযন্ত্রে রূপ নেয়নি। ইসলাম সবসময়ই আমাদের সে কথোপকথনের অংশ ছিল।

বাবার প্রজন্মের মানুষেরা অনেক বড় বড় রাজনৈতিক পরিবর্তন দেখেছেন। ব্রিটিশ শাসন থেকে ইন্ডিয়ার স্বাধীনতা। ইন্ডিয়ার সাথে হায়দারাবাদের সংযোজন এবং তার ফলস্বরূপ মুসলিমদের গণহত্যা ও শাসক পরিবর্তন। তার পূর্ববর্তী প্রজন্ম অর্থাৎ আমাদের দাদার আমলের মানুষজন দেখেছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং ইন্ডিয়ায় ব্রিটিশ শাসন। শিক্ষিত হওয়ায় আমাদের বংশের অনেকেই ছিলেন হায়দারাবাদ সরকারের বিভিন্ন উচ্চ পদে আসীন। তাই শাসন ক্ষমতা হাতবদল হওয়ার পর আমাদের মতো মানুষজন বড় রকমের একটা ধাক্কা খেয়েছিল। তবে আমরা খুব বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হইনি, বরং যারা বিনা অপরাধে শুধুমাত্র সেখানে উপস্থিত থাকার কারণে খুন হয়েছিল তারাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এটা সত্যি যে, এক মুহূর্তের মধ্যে জীবিকা, সম্মান সব খুইয়ে নিঃস্ব হয়ে যাওয়াটা মোটেই সহজ কিছু ছিল না। আমাদের আগের প্রজন্ম সে ভয়াবহ বিপর্যয় মোকাবেলা করে যেভাবে তাদের আত্মমর্যাদা ধরে রেখেছিল তা ছিল আমাদের জন্য একটি শিক্ষণীয় বিষয়। এ বোধ আমাদের প্রজন্মের যেসব তরুণের মধ্যে ছিল তারা সে শিক্ষা গ্রহণ করতে পেরেছিল।

বাবা কবিতা ভালোবাসতেন। শিক্ষণীয় কবিতার শত শত লাইন বাবার মুখস্থ ছিল। তিনি আমাদের কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতেন, তারপর তা

বুঝিয়ে দিতেন। মায়েরও কবিতার ব্যাপারে আগ্রহ ছিল এবং তিনি নিজেও অনেক কবিতা লিখেছেন। বাবা আমাদের ব্যাখ্যা করে অনেক কবিতার অর্থ বোঝাতেন। এটা আমাদের জন্য খুবই শিক্ষণীয় ছিল। আমার মতে, জীবনকে গভীর থেকে উপলব্ধি করতে সাহিত্য এবং কাব্যচর্চা বেশ সহায়ক এবং আমার বাবার প্রজন্ম এর সদ্ব্যবহার করেছিলেন। তখনকার দিনে চিঠি, বক্তৃতা কিংবা সাধারণ আলাপ-চারিতায় কবিতার লাইনের উদ্ধৃতি দিতে পারাটা ব্যক্তির জ্ঞানের পরিচয় বহন করত। সেসব অসাধারণ প্রজ্ঞাপূর্ণ কথাগুলোর ভেতর যেন লুকিয়ে আছে কয়েক শতাব্দীর জ্ঞান। জ্ঞানের যে কোনো সীমা নেই সেটা আমি তাদের উদ্ধৃতিগুলো থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম। তখন শুধু মাসজিদে যাওয়াকেই আমরা ইসলাম মনে করতাম না। আমাদের জীবনে ইসলামের পরিধি ছিল আরও ব্যাপক। এর মধ্যে মূল বিষয় ছিল দৈনন্দিন কাজকর্মকে কুরআন, সুন্নাহ আর জ্ঞানীদের বাণীর আলোকে সাজানো। আমার মনে পড়ে না যে, অতীতে কখনো ফিকহ বা মাযহাবের পার্থক্য নিয়ে কোনো আলোচনা করেছি। তখন শুধু আল্লাহর মহত্ত্ব, ইসলামি ইতিহাস, রাসুলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবাদের সীরাহ, অন্যান্য নবী-রাসূলের জীবন এবং আমাদের পূর্বসুরী আলেমদের নিয়ে আলোচনা হতো।

সার্বিক উন্নয়নে বিনিয়োগ

একটা শিশুর সার্বিক উন্নয়ন বলতে আমরা কেবল তার প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশুনা ও খেলাধুলাকে বুঝাই। কখনো কখনো এ দুটোর সাথে যোগ করি অন্যের সাথে তার মেলামেশার দক্ষতাকে। আমি জানি না, আমাদের ক'জন বাচ্চার আত্মিক উন্নয়নকেও বিবেচনায় আনি। অথচ মুসলিম হিসেবে আমরা বিশ্বাস করি যে, আত্মিক উন্নয়নই কেবল শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে। আমাদের সন্তানরা সালাতে কেন আনন্দ পায় না—এ বিষয়টা নিয়ে আমরা ক'জন চিন্তা করি? আমরা ক'জন ভেবে দেখেছি, কেন আমাদের সন্তানরা সফলতা অর্জনের মাধ্যম হিসেবে দু'আকে কাজে লাগাচ্ছে না? আমরা ক'জন উদ্বিগ্ন যে, আমাদের সন্তানরা কুরআন তিলাওয়াত করে নিতান্ত বাধ্য হয়ে; তারা কুরআনকে মোটেও উপভোগ করে না? আমরা কতজন এ ব্যাপারে উদ্বিগ্ন যে, বিশ-তিরিশ বছরেও

আমাদের সন্তান ঠিকমতো সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করতে পারে না কিংবা ফজরের দু রাকাআত সালাতের ইমামতি করার যোগ্যতাও রাখে না? আমরা ক'জন এ ব্যাপারে চিন্তিত যে, আমরা যখন মারা যাব তখন কীভাবে আমাদের গোসল দিতে হবে, কীভাবে জানাজার সালাহ আদায় করতে হবে এবং কীভাবে কবর দিতে হবে—এ সম্পর্কে সন্তানদের কোনো ধারণাই নেই। পিতা-মাতার প্রতি এ ধর্মীয় অন্তিম ক্রিয়াটুকু তারা ভাড়া করে আনা লোকদের দ্বারা সম্পন্ন করবে। সন্তানদের আত্মিক উন্নয়নের প্রতি নজর না দেওয়ার পরিণতি কতোই না বেদনাদায়ক!

তাহলে আপনার কী করা উচিত?

নফ্স তথা প্রবৃত্তির নিকৃষ্ট আশা-আকাঙ্ক্ষাকে দমনের মধ্য দিয়ে মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নয়ন ঘটে। নফ্স যত শক্তিশালী হয়, রূহ বা আত্মা তত দুর্বল হয়ে যায়। আপনি যতই নফ্সের খাওয়া-দাওয়া যোগাবেন, এটা ততই শক্তিশালী হতে থাকবে। এক সময় এ নফ্স আত্মাকে পরাভূত করে নিতান্ত দুর্বল করে ফেলে এবং আত্মা অনাহারে মারা পড়ে। তাই বাচ্চাদের নফ্সের চাহিদাকে দমন করার মূল্য অনুধাবন করতে শেখান। প্রথমত আসে খাবার-দাবার ও খেলনা। তারপর আসে শারীরিক আরাম-আয়েশ এবং আরও দামী দামী খেলনা। বলা হয়ে থাকে যে, একজন পুরুষ আর এক জন বালকের মধ্যে পার্থক্য হলো তাদের খেলনার মূল্য। যে বালকটা পাঁচ বছর বয়সে সুন্দর সুন্দর খেলনা গাড়ি সংগ্রহ করে, তার সাথে পঞ্চাশ বছরের সে লোকটির কোনো পার্থক্য নেই, যে কেবল শখের বসে ফেরারি এবং ল্যাম্বরগিনির লেটেস্ট মডেল গাড়ি কেনে। তারা উভয়েই মানসিক দিক থেকে একই পর্যায়ের। দু'জনই বালক; নতুন খেলনা পেয়ে তারা দু'জনেই খুশি। যখন এগুলোর নতুনত্ব চলে যায়, তখন তারা নাখোশ হয়ে যায়। নতুন আরেকটার জন্য তাদের অস্থিরতা শুরু হয়ে যায়। সম্পর্কের ক্ষেত্রেও মানুষের মধ্যে এ অভ্যেসটা দেখা যায়। পরিণতিতে হয় বিবাহ বিচ্ছেদ। মানুষ তার পেশার ক্ষেত্রেও এ একই কাজ করে। এক কোম্পানি থেকে অন্য কোম্পানিতে লাফ দিতে থাকে, যে পর্যন্ত না বার্ধক্য তার লাফানোর শক্তিটুকু কেড়ে নেয়। শেষ পর্যন্ত তাদের কাছে তেমন কোনো অভিজ্ঞতাই থাকে না শুধুমাত্র লাফানোর অভিজ্ঞতাটা ছাড়া।

নফ্সের অস্বীকার করাকে সাইকোলজির ভাষায় বলা হয় ‘ডিলেইং গ্রাটিফিকেশন’। ছোট বাচ্চাদের সাফল্য পরিমাপের একটি বিশেষ লক্ষণ এটি। ‘ডিলেইং গ্রাটিফিকেশন’-এর মূল কথাই হলো আখিরাতের প্রতি মনোযোগী হওয়া। এক্ষেত্রে একজন মানুষ এমন একটা খাতে বিনিয়োগ করে যার বিনিময় সে এখন লাভ করবে না; লাভ করবে মৃত্যুর পরে। কারণ সে ব্যাংক মালিকের ওপর তার ঈমান আছে যিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি এমন বিনিময় দেবেন যা পৃথিবীর কোনো বিনিয়োগেই দেওয়া হয় না। এটাকেই বলা হয় ইয়াকিন। তাই ‘ডিলেইং গ্রাটিফিকেশন’ এবং দীর্ঘ মেয়াদী কাজের শিক্ষা দেওয়া শিশুদের উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং সাফল্যের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। অথচ বিষয়টির প্রতি আমাদের কোনো মনোযোগই নেই। বরং ‘বাচ্চাদের শান্ত করিয়ে রাখতে’ আমরা তৎক্ষণাৎ খেলনা, খাবার-দাবার, টাকা-পয়সা হাবিজাবি দিয়ে বিপরীত মনোভাব গঠনে উৎসাহিত করি যাকে বলা হয় ‘ইনস্ট্যান্ট গ্রাটিফিকেশন’। এর দ্বারা সত্যিকার অর্থে আমরা বাচ্চাদের শিক্ষা দেই যে, তারা যত বেশি উপদ্রব করবে তত বেশি খেলনা পাবে। আর এভাবেই আমরা তাদের জীবনের নিশ্চিত ব্যর্থতার লিপি রচনা করি। ‘ইনস্ট্যান্ট গ্রাটিফিকেশন’-এর খারাপ পরিণতি দেখার জন্য আমাদের খুব বেশি দূরে তাকাতে হবে না। আমাদের ভোগবাদী সমাজ ব্যবস্থা ‘ইনস্ট্যান্ট গ্রাটিফিকেশন’-এর ওপরই প্রতিষ্ঠিত। এ কারণেই আমাদের মোড়ে মোড়ে এমন শপিং মলের ছড়াছড়ি যেগুলো সারা সপ্তাহ চব্বিশ ঘণ্টাই খোলা থাকে; যেন চাহিদা পূরণ করতে আমাদের সকাল পর্যন্ত সময়টুকুও অপেক্ষা করতে না হয়। এভাবেই আমাদের চারপাশের জগৎ চলছে। কিন্তু আমরা দেখছি না—এর মধ্যে থাকা ঘূর্ণিবাতের মতো ঘূর্ণমান মৃত্যুকে, যেটা অসাবধানীদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে ধ্বংসের দোরগোড়ায়।

আমরা শিশুদের জন্য আরেকটা ব্যর্থতার স্মারকলিপি রচনা করি, যখন আমরা তাদেরকে আপন ভাই-বোনের সাথে নিজের জিনিস ভাগাভাগি করে নেওয়ার দীক্ষা না দিয়ে, বরং প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ঈর্ষা করার দীক্ষা দেই। ভাই-বোনের খুশীর জন্য এতটুকু ত্যাগ করতেও সন্তানকে উৎসাহ দেই না আমরা। আমি নিশ্চিত, এ কথাটা আপনার কাছে খারাপ লাগছে। আপনার এক বাচ্চার খেলনা যদি অন্য বাচ্চা চায় এবং তা নিয়ে যদি নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি করে, তবে সেসময়

আপনি কী করেন একটু চিন্তা করে দেখুন। আপনি দশ বারের নয় বারই এ কথা বলেন, 'কান্না করো না, আমি তোমাকে আরেকটা কিনে দেবো।' একটু ভেবে দেখুন, এ কথা দ্বারা আপনি আসলে বাচ্চাকে কী শিক্ষা দিচ্ছেন। আপনি শিক্ষা দিচ্ছেন যে, নিজের ভাই-বোনের সাথে প্রতিযোগিতা করাটা ঠিক। নিজের জিনিস নিজের কাছে রাখাটাই উচিত; অন্যের সাথে ভাগাভাগি করা উচিত না; ভাই-বোনের মনে আঘাত দেওয়া ঠিক এবং পারিবারিক বন্ধন, ভ্রাতৃত্ব এবং ভালোবাসার চেয়ে এ বস্তুগত জিনিসের গুরুত্ব বেশি। আপনি এতদিন আপনার যে আচরণকে ভালো মনে করে আসছেন, তার এরকম কটু বিশ্লেষণ শুনে নিশ্চয় আপনি আহত হচ্ছেন। কিন্তু বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল করে একটু চিন্তা করে দেখুন যে, বড় হওয়ার পর আজ আপনার সন্তানটি কী করছে। তার সব আচার-আচরণকে গোড়া থেকে বিশ্লেষণ করে দেখুন। আপনি দেখতে পাবেন, এর পেছনে আছে ছোটবেলার অনিয়ন্ত্রিত ক্রোধ। অথচ শৈশব ছিল জীবনের অতীব প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়ার একটি চমৎকার সময়-সুযোগ যা আপনি নষ্ট করেছেন এবং বর্তমানে তার এ অবস্থার বীজ আপনিই বপন করেছেন। আমি এমন অনেক পরিবারের কথা জানি যেখানে এক ভাই অন্য ভাইয়ের সাথে কথা পর্যন্ত বলে না। সন্তানেরা তার চাচা-চাচীর সাথে অসম্মানসূচক আচরণ করে এবং তাদের বাবা-মা নীরবে সন্তানদের এসব আচরণকে সমর্থন করে। আমি এমন অনেক পরিবারের কথা জানি যেখানে সন্তানরা সম্পত্তির জন্য বাবা-মায়ের বিরুদ্ধে মামলা করেছে। আমি এমন অনেক পরিবারের কথা জানি যেখানে ভাই ভাইয়ের বিরুদ্ধে এবং বোন বোনের বিরুদ্ধে মামলা করে করে আইনজীবীদের ভুঁড়ি বাড়ানোর প্রতিযোগিতায় নেমেছে।

আবার আমি এমন পরিবারের কথাও জানি যেখানে ভাইয়েরা স্বেচ্ছায় তাদের বোনদের জন্য সম্পত্তির অংশ ছেড়ে দিয়েছে। তারা বলে, 'আমাদের যথেষ্ট আছে। আমরা আল্লাহর পুরস্কার চাই।' আমি এমন অনেক পরিবারের কথা জানি যেখানে ভাই-বোনেরা তাদের বাবা-মায়ের নামে একটি মাসজিদ বানাতে একমত হয়েছে। তাদের মতে, তাদের যথেষ্ট আছে। এ মাসজিদ হবে তাদের বাবা-মা-এর জন্য সাদাকায়ে জারিয়া। সে বাবা-মা কতোই না সৌভাগ্যবান। এ সন্তানরাও তাদের নিজেদের সন্তানদের জন্য মিলেমিশে থাকা ও পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার এক চমৎকার বার্তা দিয়ে যাচ্ছে। এসব কথা

বলছি যেন আপনারা বুঝতে পারেন যে, এ ধরনের আচরণ কেবল আমাদের সালাফে সালিহিনদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; যারা সত্যিকার অর্থে সালাফদের অনুসরণ করে তাদের মধ্যেও থাকা সম্ভব। বস্তুত কারও অনুসরণ করা বলতে তার ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করাকে বুঝায় না; বরং তিনি যা করেছেন তা করাকে বুঝায়।

সন্তানের আত্মিক উন্নয়নের ব্যাপারে আপনার উদ্বেগ হচ্ছে আপনার নিজের ঈমান এবং আখিরাতের ওপর আপনার বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ। কারণ যাদের ইয়াকিন তথা গভীর বিশ্বাস আছে কেবল তারাই এ ব্যাপারে উদ্বিগ্ন থাকে এবং এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। সাদাকায়ে জারিয়া সম্পর্কিত হাদীসে আবু হুরাইরা ﵁ বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

> ‘মানুষ মৃত্যুবরণ করলে তার যাবতীয় আমল বন্ধ হয়ে যায়, কেবল তিনটি বাকি থাকে—সাদাকায়ে জারিয়া বা অবিরত দান, উপকারী জ্ঞান এবং এমন নেক সন্তান যে তার জন্য দু’আ করে।’ (সহীহ মুসলিম)

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম আন নওয়াওয়ী (রহ.) বলেছেন,

> আলিমগণ বলেন যে, এ হাদীসের মানে হলো, যখন কেউ মারা যায় সাথে সাথেই তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়। নতুন করে পুরস্কার লাভের সব সুযোগ শেষ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি ক্ষেত্র অবশিষ্ট থাকে। কারণ তার নিজের কারণেই এগুলো অব্যাহত থাকে। এগুলো হলো—
>
> তার সন্তানকে তার উপার্জন হিসেবে গণ্য করা হবে,
>
> অন্যদের শিক্ষা দেওয়া বা লেখনীর মাধ্যমে যে জ্ঞান সে রেখে গিয়েছে সে জ্ঞান, এবং
>
> সাদাকায়ে জারিয়া।

নিম্নোক্ত বর্ণনাটিতে আরেকটু বিস্তারিতভাবে এসেছে:

আবু হুরাইরা ﵁ বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

> ‘মৃত্যুর পর একজন ঈমানদারের কাছে যেসব ভালো কাজ পৌঁছায়

সেগুলো হলো—জ্ঞান যা সে নিজে অর্জন করেছে এবং ছড়িয়ে দিয়েছে, একজন ধার্মিক সন্তান যাকে সে দুনিয়াতে রেখে গিয়েছে, রেখে যাওয়া কুরআন, তার তৈরি করা মাসজিদ, পথিকের জন্য নির্মিত ঘর, তার নির্মিত খাল, সুস্থ থাকাবস্থায় সে দুনিয়ায় যে দান করে গিয়েছে। এ দানগুলো মৃত্যুর পরও তার কাছে পৌঁছাবে।' (ইবনে মাজাহ; আলবানী (রহ.) হাদীসটিকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন)

এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়টি হলো, আমাদের মধ্যেই যদি আত্মিক ত্রুটি থাকে তবে সন্তানদের আত্মিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। বাচ্চারা তাদের চোখ দিয়ে শোনে এবং দেখে দেখে শেখে। আপনি যদি জাঙ্ক ফুড আর টেলিভিশনে অভ্যস্ত হন, তাহলে আপনি এমন এক নাদুশ-নুদুশ বাচ্চা পাওয়ার জন্য প্রস্তুত হউন—জীবনে যার অর্জন হবে খুবই কম এবং খুব সম্ভবত সে হার্টের রোগে আক্রান্ত হবে। আর আপনি যদি নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত ও তাহাজ্জুদ আদায় করেন, তাহলে আশা করুন যে—আপনি যখন বৃদ্ধ ও অসুস্থ হয়ে পড়বেন এবং আপনার সেবাযত্নের প্রয়োজন হবে, তখন আপনার সন্তান রাত জেগে আপনার সেবা-যত্ন করবে। আপনি যদি শপিং করায় আসক্ত থাকেন এবং অন্যদের প্রতি আপনার ড্যাম কেয়ার ভাব থাকে; তবে ধরে নিন আপনার সন্তান উত্তম চারিত্রিক মাধুর্যের পরিবর্তে তার শার্টের লেভেল অথবা তার ফোন সেটটির ব্র্যান্ড দিয়ে নিজেকে মূল্যায়ন করতে চাইবে। মনে রাখবেন, সন্তানদের প্রত্যেকটি চাওয়াকে তৎক্ষণাৎ পূরণ করা জীব-জন্তুদের জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য; মানুষের নয়। লোমবিহীন শরীর আর দু পা দিয়ে হাঁটলেই কেউ মানুষ হয়ে যায় না। বরং অনুধাবন করতে পারা, শিক্ষা গ্রহণ করা এবং ভবিষ্যতের জন্য বিনিয়োগ করাই আমাদেরকে মানুষ হিসেবে পরিচিতি দান করে। এ কারণেই আমি অন্যদের বলি, 'আপনি সিদ্ধান্ত নিন যে, আপনি কি সন্তান চান নাকি কিড? কিড মানে তো ছাগলছানা। সন্তানকে শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হয়; শুধু থাকা-খাওয়া-পরা দেওয়াটাই যথেষ্ট নয়।' তাই আপনিই সিদ্ধান্ত নিন। আপনি যেভাবে চান সন্তান সেভাবেই বেড়ে ওঠবে।

সন্তানদের আত্মিক উন্নতির দিকে নজর দিন। কেননা এর সাথেই তাদের পার্থিব ও পরকালীন সাফল্য জড়িত। যে শিশুটির মনোযোগ থাকে আল্লাহকে

সন্তুষ্ট করার দিকে সে আপনা থেকেই বাবা-মা, ভাই-বোন ও পরিবার পরিজনের প্রতি সদয় হবে। সে অন্যদের সম্মান দেবে এবং তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হবে। সে বড়দের সম্মান করবে এবং ছোটদের ভালোবাসবে। তার জীবন হবে নিয়মতান্ত্রিক; কেননা তাকে সেভাবেই দৈনিক পাঁচবার তার রবের সামনে দাঁড়াতে হয়। সে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মিষ্টতা ও তৃপ্তি উপলব্ধি করতে পারে। এ কারণে সে তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ খুঁজতে থাকবে। তাহাজ্জুদ আদায় শুরু করবে। কারণ এটি হলো আল্লাহর সাথে সংযোগ স্থাপনের মোক্ষম সময়। সে আখিরাতের জন্য বিনিয়োগ করার মূল্য বুঝতে পারবে। তাই সে হবে উদার, দানশীল—বিশেষ করে ইসলাম এবং মুসলিমদের জন্য কল্যাণমূলক কাজে। সে হবে একজন উত্তম প্রতিবেশী এবং সমাজের একজন দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি। যাদের সাথে সে বসবাস করে তাদের সবাই তাকে সম্মান করবে। সে কখনো মাদকাসক্ত হয়ে পড়বে না। সে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন থাকবে। তাই সে হবে এমন একজন—যে পাপ করতে লজ্জাবোধ করবে এবং কোনো পাপ করে ফেললে সাথে সাথে তাওবা করবে। এ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ ﷺ হাদীসে কুদ্‌সিতে আমাদের জানিয়েছেন যে, আল্লাহ ﷻ বলেন,

> হে আদম সন্তান, যতক্ষণ তুমি আমাকে ডাকতে থাকবে, আমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে থাকবে, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেবো; তুমি যা-ই করো না কেন আমি কিছুই মনে করব না। হে আদম সন্তান তোমার পাপ যদি আকাশের মেঘ পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং তারপরও যদি তুমি আমার কাছে ক্ষমা চাও; তাহলেও আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেবো। হে আদম সন্তান, তুমি যদি পৃথিবী পরিমাণ পাপ নিয়েও আমার সামনে আসো এবং আমার সাথে কোনো কিছু শরিক না করো; তাহলে আমি তোমার জন্য সে পরিমাণ ক্ষমা নিয়েই হাজির হবো।' (আত তিরমিযী এবং মুসনাদে আহমাদ)

যে শিশুটির মনে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং তার নিজের আত্মিক উন্নয়নের উদ্দেশ্য থাকে, সে অবশ্যই রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহকে ভালোবাসবে। কারণ সে বুঝতে পারবে যে, এটা হলো আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর ওপর ঈমান আনয়নের

বাহ্যিক প্রকাশ। সে বুঝতে পারবে, নিজেকে মুসলিম হিসেবে দাবী করা আর জেনেশুনে সুন্নাহর বিরুদ্ধে যাওয়া হলো নিজের সাথেই মিথ্যাচার। আর এর পরিণতিতে তাকে বিব্রত ও ভোগান্তির শিকার হতে হবে। কারণ যখন তাকে প্রশ্ন করা হবে: 'তোমাদের মাঝে যাকে (রাসূল হিসেবে) পাঠানো হয়েছিল তাঁর সম্পর্কে তুমি কী বলো?' এ প্রশ্নের উত্তর সে দিতে পারবে না। কীভাবে সে বলবে, 'তিনি ছিলেন আল্লাহর রাসূল ﷺ। আমি তাঁর ওপর ঈমান এনেছি এবং তাঁর অনুসরণ করেছি'; যখন তার জীবনই সাক্ষ্য দেয় যে, এর কোনোটিই সে করেনি। যে শিশুটির আত্মিক উন্নয়ন সাধিত হয়, সে হবে তাদের একজন যাদের সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, আল্লাহ বলেছেন,

> যে ব্যক্তি আমার কোনো বন্ধুর সাথে শত্রুতা করে, আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করছি। আমার বান্দার প্রতি যা ফরয করেছি তা দ্বারাই সে আমার অধিক নৈকট্য লাভ করে। আমার বান্দা নফল কাজের মাধ্যমেও আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে। অবশেষে আমি তাকে ভালোবেসে ফেলি। যখন আমি তাকে ভালোবাসি, তখন আমি তার কান হয়ে যাই যা দিয়ে সে শোনে, তার চোখ হয়ে যাই যা দিয়ে সে দেখে, তার হাত হয়ে যাই যা দিয়ে সে ধরে এবং তার পা হয়ে যাই যা দিয়ে সে চলাফেরা করে। সে আমার কাছে কিছু চাইলে আমি তাকে তা দেই। সে যদি আমার নিকট আশ্রয় কামনা করে, তাহলে আমি তাকে আশ্রয় দেই। আমি যা করার ইচ্ছে করি, সে ব্যাপারে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগি না কেবল মুমিনের আত্মার ব্যাপার ছাড়া। সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে আর আমি তাকে কষ্ট দিতে অপছন্দ করি।' (আল বুখারী)

নিজেকে প্রশ্ন করুন, আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের দু'আর মূল্য কতখানি! বিশেষ করে যখন আপনি আপনার কবরে শায়িত থাকবেন এবং কোনোভাবেই নিজেকে কোনো সাহায্য করতে পারবেন না, সে মুহূর্তে আপনার ক্ষমা লাভের জন্য তার দু'আ কতটা জরুরী। যদি সে দু'আর মূল্য উপলব্ধি করতে পারেন, তাহলে বুঝার চেষ্টা করুন যে, আপনার হাতেই আল্লাহর সে প্রিয় বান্দা গড়ে তোলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

আপনি কি সে দায়িত্ব পালন করতে চান, নাকি আপনি কেবল একটি ছাগলছানা অর্থাৎ কিডকে বড় করতে চান?

আল্লাহ কে?

ইসলামের মূল ভিত্তি হচ্ছে আত-তাওহীদ বা আল্লাহর এককত্ব। এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর মর্যাদা, কাজ-কর্ম, হুকুমত ও সৃষ্টিতে কোনোরূপ অংশী স্থাপন না করে শুধুমাত্র এককভাবে তাঁর ইবাদাত করা এবং বিশ্বাস করা যে, তাঁর কোনো অংশীদার নেই, কোনো সন্তান-সন্ততি কিংবা কোনো উত্তরসূরি নেই। আল্লাহ ﷻ নিজের পরিচয় দিয়েছেন এভাবে,

'তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই; তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত। তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা। তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তিনি একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তা দাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, তিনি মাহাত্ম্যের একক অধিকারী; তারা যেসব ব্যাপারে শিরক করছে, আল্লাহ ﷻ সেসব কিছু থেকে পবিত্র। তিনি আল্লাহ, তিনি স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, উত্তম নামসমূহ তাঁরই, সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।' (সূরা আল হাশর, ৫৯:২২-২৪)

'আল্লাহ ﷻই হচ্ছেন আসমানসমূহ ও যমীনের নূর; তাঁর এ নূরের উদাহরণ হচ্ছে— তা যেমন একটি তাকের মতো, তাতে একটি প্রদীপ (রাখা) আছে; প্রদীপটি (আবার) স্থাপন করা হয়েছে (স্বচ্ছ একটি) কাচের আবরণের ভেতর; কাচের আবরণটি হচ্ছে উজ্জ্বল একটি তারার মতো—তা প্রজ্বলিত করা হয় পবিত্র যয়তুন গাছ (নিঃসৃত তেল) দ্বারা, যা (শুধু) পূর্ব দিকের (সূর্যের আলো থেকেই আলোকপ্রাপ্ত) নয়, পশ্চিম দিকের (সূর্যের আলোকপ্রাপ্তও) নয়; (বরং এটি সবসময়ই প্রজ্বলিত থাকে); আবার এর তেল এতো পরিষ্কার, (দেখলে) মনে হয়, তা বুঝি নিজে নিজেই জ্বলে ওঠবে, যদি আগুন তাকে (ততোক্ষণে) স্পর্শ না-ও করে থাকে; (আর যদি আগুন স্পর্শ করেই ফেলে তাহলে তা হবে) নূরের ওপর (আরো) নূর; আল্লাহ ﷻ তাঁর এ নূরের দিকে যাকে চান তাকেই হেদায়াত দান করেন; আল্লাহ ﷻ (এভাবে) মানুষদেরকে (বোঝানোর) জন্য নানা উপমা পেশ করে থাকেন; আল্লাহ ﷻ প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কেই সম্যক অবগত আছেন।' [সূরা আন নূর; ২৪:৩৫]

আয়াতুল কুরসীতে মহান আল্লাহ নিজের পরিচয় দিয়েছেন এভাবে,

'আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই; তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর। কে আছ এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? তাদের পূর্বাপর সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোনো কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছে করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান।' [সূরা আল বাকারা; ২:২৫৫]

এ আয়াতগুলো পড়ার সময় এর মর্যাদাপূর্ণ বাচনভঙ্গি আমাকে ভীষণভাবে নাড়া দিতো। আপনি যদি আরবি বোঝেন তাহলে এ আয়াতগুলো আপনার অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে দেবে এবং আপনাকে অশ্রুসজল করে তুলবে। আল্লাহর এ শক্তিশালী বাণীগুলো আপনার হৃদয়কে ধাক্কা লাগাবে।

স্বয়ং আল্লাহ মানুষের সাথে কথা বলছেন। আমার স্রষ্টা আমার সাথে কথা বলছেন! এ অনুভূতি যদি আপনাকে শিহরিত না করে তবে আর কোনো কিছুই আপনাকে শিহরিত করবে না। একবার কুরআনের একটি আয়াতে আমি খুঁজে পেলাম, মহান আল্লাহ বলছেন,

'(হে নবী) আমার কোনো বান্দা যখন তোমাকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে (তাকে তুমি বলে দিও), আমি (তার একান্ত) কাছেই আছি; আমি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেই যখন সে আমাকে ডাকে, তাই তাদেরও উচিত আমার আহ্বানে সাড়া দেওয়া এবং (সম্পূর্ণভাবে) আমার ওপরই ঈমান আনা। আশা করা যায়, এতে করে তারা সঠিক পথের সন্ধান পাবে।' [সূরা আল বাকারা; ২:১৮৬]

আল্লাহর দয়া এবং সঠিক পথ দেখানোর এ আশ্বাস আমার হৃদয় ছুঁয়ে যায়। আমি তখন কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমি আল্লাহর কাছে সাহায্য ও নিরাপত্তা চাইলাম। আরও সামনে গিয়ে আল্লাহর কিতাবে আমি খুঁজে পেলাম,

'আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য নিষ্কৃতির পথ করে দেবেন। এবং তাকে এমন জায়গা থেকে রিযিক দেবেন যা সে ধারণাও করেনি। যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে তার জন্য তিনিই যথেষ্ট।' [সূরা আত তালাক; ৬৫:২-৩]

'আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের যথার্থই জানেন। আর অভিভাবক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট এবং সাহায্যকারী হিসেবেও আল্লাহই যথেষ্ট।' [সূরা নিসা; ৪:৪৫]

কুরআনের কাছে ফিরে গিয়ে যে কতবার আমি পথের দিশা পেয়েছি সে সুদীর্ঘ কাহিনী বর্ণনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। কারণ, কুরআনের একেবারে প্রথম সূরাতেই আল্লাহ ﷻ বলেছেন, মানুষ যেন সঠিক পথের সন্ধান পেতে তাঁর সাহায্য চায়। আর তিনি পথ দেখানোর প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন:

'শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। যিনি নিতান্ত মেহেরবান ও দয়ালু। যিনি বিচার দিনের মালিক। আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদাত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদেরকে সরল পথ দেখাও; সে সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। তাদের পথ নয়; যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। ' [সূরা আল ফাতিহা; ১:১-৭]

আর ঠিক পরের সূরাতেই তিনি বলেছেন, যারা আল্লাহর ওপর বিশ্বাস রাখে এবং তাঁকে ভয় করে তাদের জন্য এ কুরআন পথ-নির্দেশিকা স্বরূপ:

'(এ) সে মহাগ্রন্থ (আল কুরআন), তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে (এ কিতাব কেবল) তাদের জন্যই পথপ্রদর্শক।' [সূরা আল বাকারা; ২:২]

এ আয়াতগুলোর উদ্ধৃতি দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো ইসলামের মূল ভিত্তি আত-তাওহীদকে ব্যাখ্যা করা। তাওহীদই হচ্ছে আমার এবং আমার রবের মধ্যে একমাত্র সংযোগসূত্র। তিনি আমার প্রার্থনা শোনেন এবং সাড়া দেন। মুসলিমরা এমন কোনো সত্তার ইবাদাত করে না যার মানুষের মতোই দোষ-গুণ দু'টোই রয়েছে। আল্লাহ ﷻ কারও মুখাপেক্ষী নন, সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি সকল দোষ-ত্রুটির উর্ধ্বে এবং সকল শক্তি ও দয়ার উৎস। তিনিই ইবাদাতের যোগ্য একমাত্র সত্তা।

মুসলিমরা কোনো সৃষ্ট বস্তুর ইবাদাত করে না। তারা শুধু সৃষ্টিকর্তারই ইবাদাত করে। মুসলিমরা কোনো সাধু বা নবী, ধ্যান-ধারণা কিংবা কোনো ভূ-খণ্ড বা পতাকার পূজো করে না। এমনকি তারা নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপাসনাও করে না। স্বয়ং নবী ﷺ-ই তাঁর শেষ সময়ে কঠোরভাবে তাঁর ইবাদাত করতে নিষেধ করে গিয়েছেন। জীবনের শেষ মুহূর্তেও তিনি বলে গিয়েছিলেন, 'আমার

কবরকে ইবাদাতের স্থানে পরিণত করো না। যারা নবী ও সৎ ব্যক্তিদের কবরকে ইবাদাতের স্থানে পরিণত করে তাদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ।'

সুতরাং মুসলিমরা মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপাসনা করে না; বরং মুহাম্মাদ ﷺ-এরও প্রভু প্রতিপালক যিনি সে এক আল্লাহরই উপাসনা তারা করে। মুসলিমরা চাঁদ-সূর্য কিংবা তারার ইবাদাত করে না বরং সকল নক্ষত্রের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর ইবাদাত করে। তারা পশু-পাখি, নদী, পাহাড়, হ্রদ বা সমুদ্রের ইবাদাত করে না বরং এসব কিছুর সৃষ্টিকর্তার ইবাদাত করে; যিনি এগুলোর গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করেন এবং যাঁর ইচ্ছায় এগুলো প্রবাহিত হয় বা শুকিয়ে যায়।

কোনো কিছু কীভাবে ঘটে তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা মানুষ বুঝতে পারে, কিন্তু কেন ঘটে তা মানুষ বুঝতে পারে না। তবে মুসলিমদের কাছে বিষয়টি স্পষ্ট। আল্লাহর হুকুমেই এমনটা হয়; তিনি যেভাবে চান ঠিক সেভাবেই হয়। ইসলাম বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে স্বীকৃতি দেয় এবং সম্মান করে। কারণ এ জ্ঞান শুধু আল্লাহর সর্বময় ক্ষমতারই ঘোষণা দেয়। মুসলিমরা উপলব্ধি করে যে, বিজ্ঞান বস্তুর গভীরে গিয়ে তার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করে, আর ইসলাম তার উদ্দেশ্য প্রকাশ করে। মুসলিমরা কোনো কিছুর প্রকৃতির সাথে তার উদ্দেশ্যকে গুলিয়ে ফেলে না। তারা জানে যে, 'কীভাবে ঘটে' আর 'কেন ঘটে' এ দু'টি বিষয় এক নয়। তারা জানে যে, এ দু'টোর অবস্থান পৃথক। তারা এ-ও জানে যে, 'কেন' সবসময় 'কীভাবে'র ওপর প্রাধান্য পায়। কারণ, উদ্দেশ্যের ওপরেই প্রকৃতি নির্ভর করে। আল্লাহ ﷻ-ই প্রথমে উদ্দেশ্য ঠিক করেন এবং তারপর তা বাস্তবায়নের জন্য নিয়ম-কানুন ও ঘটনাবলী সৃষ্টি করেন।

আকস্মিক ঘটনাক্রমে এ মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে—এমন অযৌক্তিক কথা মুসলিমরা বিশ্বাস করে না। মুসলিমরা বিশ্বাস করে যে, একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে আল্লাহ ﷻ এ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আজকের কতিপয় বিজ্ঞানী বলতে চান, ঘটনাক্রমে পৃথিবী সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। অথচ তারা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন যে, পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে তোলার জন্য যেসব প্রয়োজনীয় উপাদান দরকার সেগুলোর 'হঠাৎ' করে একত্রিত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা এক ট্রিলিয়ন ভাগের এক ভাগ! যা সত্যি অবাস্তব। তারপরও মানুষ বিশ্বাস করতে চায় না যে, পৃথিবীর সৃষ্টি নেহাত কোনো ঘটে যাওয়া ঘটনা নয় বরং স্রষ্টার সুপরিকল্পিত

ইচ্ছের বাস্তবায়ন। মুসলিমদের এটা বিশ্বাস করতে মোটেই দ্বিধা করে না। আর এজন্যই আমরা আল্লাহর ইবাদাত করি। কারণ, তিনি ছাড়া অন্য কারোর পক্ষেই এ গোটা মহাবিশ্ব তথা আসমান, যমীন, গ্রহ, নক্ষত্র, পাহাড়-পর্বত, সাগর, নদী সৃষ্টি করা সম্ভব নয়।

ভয় না ভালোবাসা?

একটি প্রশ্ন মানুষের মাঝে প্রায়ই সংশয় সৃষ্টি করে, 'আল্লাহকে কি ভয় পাওয়া উচিত, নাকি ভালোবাসা উচিত'?

এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে আমাদের প্রথমে আল্লাহর পরিচয় জানতে হবে। আল্লাহর পরিচয় বহন করে এমন বেশ কয়েকটি আয়াতের উদ্ধৃতি আগে দিয়েছি। সে আয়াতগুলো থেকে এটা স্পষ্ট যে, আল্লাহর সাথে মানুষের একটা সম্পর্ক আছে। কিন্তু তিনি মানুষের মতো নন, কিংবা নিছক অতিমানবীয় ক্ষমতাসম্পন্ন এমন কোনো ব্যক্তিত্ব নন যার আছে আমাদের মতোই ব্যর্থতা, আবেগ, উদ্দীপনা আর চিন্তা-ভাবনা।

আল্লাহ কখনো ক্লান্ত হন না। তিনি পরিশ্রম করেন না। তাই তাঁর বিশ্রামেরও প্রয়োজন হয় না। আল্লাহ সময় এবং স্থানের গণ্ডিতে সীমাবন্ধ নন। বরং তিনিই সময় এবং স্থান উভয়টিকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর জন্য অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সব সমান। তিনি এর প্রতিটি বিষয় ও বস্তু সম্পর্কেই সম্যক অবগত। আল্লাহর কাছে রাত-দিন বলে কিছু নেই। কারণ তিনিই চন্দ্র-সূর্য এবং রাত-দিনের সৃষ্টিকর্তা। তাঁর সৃষ্ট মানুষ তাঁর মতো নয়; যেমন একজন কাঠমিস্ত্রি তার তৈরী করা চেয়ারের মতো নয়। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ﷾ও তাঁর সৃষ্ট কোনোকিছুর মতো নন এবং তেমন হওয়ার কোনো প্রয়োজনও নেই। তাই তিনি তাঁর ইচ্ছানুযায়ী অবয়বে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি আদম ﵇-কে একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের অবয়বে সৃষ্টি করেছেন। তিনি ছিলেন মানবজাতির আদিরূপ। তিনি শিশু, সদ্য হাঁটতে শেখা বাচ্চা কিংবা কিশোর ছিলেন না। তাকে একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ হিসেবেই জীবন দেওয়া হয়েছিল। আল্লাহ আদমকে আদম ﵇-এর অবয়বেই সৃষ্টি করেছেন। আদম ﵇-ই ছিলেন মানুষের আদি পিতা।

আল্লাহ আদম ﷺ-কে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার বংশ বৃদ্ধির জন্য একটি জৈবিক প্রজনন প্রক্রিয়া সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আল্লাহ ﷻ ঠিক একইভাবে অন্যান্য সকল প্রাণীকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ যা চান, যেভাবে চান, যখন চান—তখনই তা সেভাবে করেন। তিনি কোনো নিয়ম বা সীমার মধ্যে আবদ্ধ নন। তিনি হচ্ছেন আল্লাহ।

তিনি তাঁর ক্ষমতা ও সামর্থ্যকে প্রকাশ করার জন্য সৃষ্টি করেছেন বিভিন্ন পদ্ধতি ও আকার-আকৃতি; যেন বুদ্ধিমানেরা সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টার সৃষ্টিশৈলী দেখতে পায় এবং স্রষ্টার ইবাদাত করে। অথচ মানুষ সৃষ্ট বস্তুর নৈপুণ্য দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে সে সৃষ্ট বস্তুরই উপাসনা করা শুরু করে দেয়। এ যে কত বড় বোকামী! তারা উপলব্ধি করে না যে, এ গরু-ছাগল-হাতি, পাহাড়, নদী, নক্ষত্ররাজি, মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণী উপাসনার যোগ্য নয়; বরং এ সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তাই উপাসনার একমাত্র যোগ্য সত্তা। আল্লাহ তাঁর ইচ্ছানুযায়ী তাঁর সৃষ্টির প্রতিপালন করেন। যতদিন ইচ্ছে প্রতিপালন করেন এবং তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সৃষ্টির সমাপ্তি ঘটান। আল্লাহ ﷻ নিজের সম্পর্কে বলেন,

‘তিনি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের স্রষ্টা। তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য যুগল সৃষ্টি করেছেন এবং চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্য থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন। এভাবে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন। কোনো কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি সব শোনেন, সব দেখেন।’ (সূরা আশ শু’আরা;২৬:১১)

আল্লাহ স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, তাঁর সদৃশ কোনো কিছুই নেই। স্বরূপ, ক্ষমতা বা মাহাত্ম্যের দিক থেকে সৃষ্টির কোনো কিছুই তাঁর সমকক্ষ নয়। তিনি এখানে কেবল তাঁর দুটি অনন্য বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন—সর্বশ্রোতা এবং সর্বদ্রষ্টা। আল্লাহর মহিমা এবং মাহাত্ম্যের কথা চিন্তা করলে প্রথমেই আমাদের অন্তরে যে অনুভূতি হওয়া উচিত তা হলো—শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভয়। ক্ষতিকর কিছুকে আমরা যেমন ভয় করি এটা ঠিক তেমন ভয় নয়। মানুষ বা অন্যান্য সৃষ্টবস্তুর প্রতি আমরা যেমনটি অনুভব করি এটা ঠিক তেমন কোনো শ্রদ্ধা বা ভালোবাসার মিশেলও নয়।

আল্লাহ সকল সৃষ্টির ঊর্ধ্বে। সৃষ্টির মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের থেকে আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্ক ভিন্নতর। শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভয় এবং আমাদের প্রতি

আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আমাদের অন্তরে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার জন্ম নেয়। এ ভালোবাসা অনেক প্রগাঢ় এবং এর গভীরতাও অনেক অনেক বেশি।

এ ভয় হলো আমাদের ভালোবাসার সত্তাকে অসন্তুস্ট করার ভয়; যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, প্রতিপালন করছেন এবং মৃত্যুর পর বিচার দিবসে যাঁর সামনে গিয়ে আমরা দাঁড়াব তাঁকে অসন্তুস্ট করার ভয়। তাঁকে অমান্য করার ভয়। পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হওয়ার বা শাস্তি পাওয়ার ভয়। স্বাভাবিকভাবেই আমরা আল্লাহর ক্ষমতাকে ভয় করি। আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকার জন্য এ ভয়টুকু থাকা খুব দরকার। আমরা আল্লাহর ক্রোধ, তাঁর শাস্তি এবং তাঁর অসন্তুষ্টিকে ভয় করি। কিন্তু তাঁর দয়ার কথাও আমাদের মনে সর্বদা জাগ্রত থাকে। আমরা জানি যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল। যে তাওবা করে তাঁর দিকে ফিরে আসে, তিনি তার সকল অপরাধ মাফ করে দেন। দয়ার বিশালতায় তাঁর ক্রোধ ঢাকা পড়ে যায়। কুরআনে আল্লাহ ﷻ বলেন,

'বলুন, (আল্লাহ বলেন,) হে আমার বান্দারা, যারা নিজেদের ওপর যুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হইও না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত অপরাধ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তোমরা তোমাদের পালনকর্তার অভিমুখী হও এবং তাঁর আজ্ঞাবহ হও তোমাদের ওপর আযাব আসার পূর্বে। এরপর তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।' [সূরা আয যুমার; ৩৯:৫৩-৫৪]

মুসলিমরা বিশ্বাস করে যে, একমাত্র আল্লাহই পারেন সকল পাপ ক্ষমা করতে এবং তিনি যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করবেন। তিনি একজনকে অন্যজনের অপরাধের শাস্তি দেন না। তাই ঈসা عليه السلام বা অন্য কেউ সকলের পাপের বোঝা নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন এমনটা মুসলিমরা বিশ্বাস করে না। আল্লাহ বলেছেন, 'কেউ কারও বোঝা বহন করবে না।' প্রত্যেককে তার নিজ কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দেওয়া হবে কিংবা পুরস্কৃত করা হবে। এটাই হচ্ছে ন্যায়বিচার। আর ইসলামে ন্যায়বিচারকে সর্বোচ্চ স্থান দেওয়া হয়। একারণেই ইসলামে অন্যায় ও অবিচার হলো মারাত্মক অপরাধ। আর শিরক হচ্ছে সবচেয়ে বড় যুলুম ও জঘন্য পাপাচার। কারণ এটা হচ্ছে স্বয়ং আল্লাহর প্রতি অবিচার করার। এ মর্মে কুরআনে বহু আয়াত এসেছে,

'যদি তোমরা কুফরী করো, তবে জেনে রেখো, আল্লাহ তোমাদের থেকে অমুখাপেক্ষী। তিনি তাঁর বান্দাদের থেকে কুফরী পছন্দ করেন না। পক্ষান্তরে যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে তিনি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। একের পাপের ভার অন্যে বহন করবে না। অতঃপর তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে ফিরে যাবে। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কর্ম সম্বন্ধে অবহিত করবেন। নিশ্চয় তিনি অন্তরের বিষয় সম্পর্কেও অবগত।' (সূরা আয যুমার; ৩৯:৭)

'কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। কেউ তার গুরুতর ভার বহন করতে অন্যকে ডাকলেও কেউ তা বহন করবে না; যদি সে নিকটবর্তী আত্মীয়ও হয়। আপনি কেবল তাদেরকে সতর্ক করুন, যারা তাদের পালনকর্তাকে না দেখেও ভয় করে এবং সালাত কায়েম করে। যে কেউ নিজের সংশোধন করে, সে সংশোধন করে নিজ কল্যাণের জন্যই। আল্লাহর নিকটই সকলের প্রত্যাবর্তন।' [সূরা ফাতির; ৩৫:১৮]

'যে কেউ সৎপথে চলে, তারা নিজের মঙ্গালের জন্যই সৎপথে চলে। আর যে পথভ্রষ্ট হয়, তারা নিজের অমঙ্গালের জন্যই পথভ্রষ্ট হয়। কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। কোনো রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত আমি কাউকেই শাস্তি প্রদান করি না।' [সূরা আল ইসরা; ১৭:১৫]

'আপনি বলুন: আমি কি আল্লাহকে ছেড়ে অন্য প্রতিপালক খুঁজবো, অথচ তিনিই সবকিছুর প্রতিপালক? যে যা করবে তার দায়ভার তার-ই ওপর বর্তাবে। কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। অতঃপর তোমাদের সবাইকে প্রতিপালকের কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অনন্তর তিনি তোমাদের বলে দেবেন, যেসব বিষয়ে তোমরা বিরোধ করতে।' [সূরা আল আন'আম; ৬:১৬৪]

কেউ কারও বোঝা বহন করবে না। কারণ প্রথমত, কারও পাপের জন্য নির্দোষ অন্য কাউকে শাস্তি দেওয়াটা খুবই অন্যায়। দ্বিতীয়ত, ইচ্ছানুযায়ী যে কাউকে ক্ষমা করে দেয়ার ক্ষমতা আল্লাহর আছে। তাই অন্য কাউকে বিসর্জন দেয়ার কোনো প্রয়োজনই নেই। বরং আন্তরিকভাবে নিজের পাপের জন্য তাওবা করলেই আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন। বেশি কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই। আমরা বিশ্বাস করি যে, নবী রাসূলরা আমাদের সতর্ক করতে এবং সঠিক পথ দেখাতে প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁরা অন্যদের পাপের বোঝা নিয়ে মৃত্যুবরণ করতে আসেননি। কারণ অন্যদের ক্ষমা প্রাপ্তির জন্য তাঁদেরকে মেরে ফেলার কোনো প্রয়োজন নেই। আন্তরিক তাওবাই যথেষ্ট। আল্লাহর দয়া ও ক্ষমার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। যারা ক্ষমা চায়, তিনি তাদেরকে ক্ষমা করেন।

আল্লাহই একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী এবং তাঁর ক্ষমতার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। তার ওপর এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই যে, অন্যদের ক্ষমা করার জন্য স্বয়ং তাঁর রাসূলের ওপর অত্যাচার চালাতে হবে কিংবা তাদের হত্যা করতে হবে। যৌক্তিক বিচারেও এমন অবান্তর ও উদ্ভট ধারণা বিশ্বাসযোগ্য নয়। ধরুন, আপনার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা যদি অন্য কারও অপরাধের জন্য আপনাকে শাস্তি দেন, তাহলে বিষয়টা কেমন হবে? হতভম্ব হওয়া ছাড়া আপনার আর কিছুই করার থাকবে না। রাজা-রাজড়াদের যুগে, রাজপুত্রদের সাথে 'মার খাওয়ার ছেলে' রাখা হতো। রাজপুত্র কোনো ভুল করলে তার বদলে শিক্ষকের হাতে এরা মার খেত। কারণ, একজন সাধারণ মানুষ হয়ে রাজপুত্রকে শাস্তি দেওয়ার এখতিয়ার শিক্ষকের ছিল না! এ প্রথা অত্যন্ত অন্যায় এবং অগ্রহণযোগ্য হওয়ায় এক সময় তা বিলুপ্ত হয়ে যায়। অথচ আল্লাহর রাসূল ঈসা ﵇-এর ব্যাপারে এমন অন্যায় অবিশ্বাস্য ও কল্পনাপ্রসূত কথাই খৃষ্টধর্মের মানুষেরা বিশ্বাস করে। যারা এ বিশ্বাস লালন করে, তারা আসলে নিজেদের সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা আল্লাহর ওপর চাপিয়ে দেয়। তারা যা বলে, আল্লাহ ﷻ সেসব থেকে মুক্ত; এবং তিনি সুমহান।

যে কেউ অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চাইলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন এবং তিনি ক্ষমা করেন। এটা খুবই বোধগম্য একটি কথা। আর দয়াময় আল্লাহ শুধু ক্ষমা করার প্রতিশ্রুতিই দেননি। তিনি বলেছেন, তাওবা করলে তিনি ব্যক্তির পাপগুলোকে ভালো কাজে রূপান্তর করে দেবেন। এর চেয়ে ভালো আর কি হতে পারে? কুরআনে এসেছে,

'যারা তাওবা করে এবং বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের গুনাহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। যে তাওবা করে ও সৎকর্ম করে, সে আল্লাহর দিকেই ফিরে আসে।' [সূরা আল ফুরকান; ২৫:৭০-৭১]

এটাই ইসলামে ভালোবাসার বার্তা। এটি স্বয়ং স্রষ্টার পক্ষ থেকে সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসার বাণী। স্রষ্টাকে চিনতে পারা, তাঁর উপাসনা ও আনুগত্য করা হচ্ছে এ ভালোবাসার মূল ভিত্তি। আল্লাহ তাঁর অনুগতদের ভালোবাসেন। অবাধ্যরা অহংকার দেখায়। আর আল্লাহ অহংকারীদের ঘৃণা করেন।

মুসলিমরা শাস্তির ভয় ও ক্ষমা লাভের আশা নিয়ে আল্লাহর সামনে দাঁড়ায়। আমরা আল্লাহর কাছে দু'আ করি, তাঁর ইবাদাত করি। তাঁর শাস্তিকে ভয় করি। পাশাপাশি আমরা অনুতপ্ত হই এবং আকুতির সাথে প্রার্থনা করি এবং আশা রাখি যে, তিনি আমাদের ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ এ ব্যাপারে বলেছেন,

'কেবল তারাই আমার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান আনে, যারা আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশপ্রাপ্ত হয়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং অহংকারমুক্ত হয়ে তাদের পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করে। তাদের পাঁজরসমূহ শয্যা থেকে আলাদা থাকে। তারা তাদের পালনকর্তাকে ডাকে ভয়ে ও আশায়; এবং আমি তাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। কেউ জানে না তার জন্য কৃতকর্মের কী কী চোখ-জুড়ানো প্রতিদান লুক্কায়িত আছে। ঈমানদার আর পাপিষ্ঠ ব্যক্তি কি কখনো সমান হতে পারে? তারা সমান হতে পারে না।' [সূরা আস-সাজদা;৩২: ১৫-১৮]

আল্লাহ আমাদের কাছে কেবল কাল্পনিক কোনো সত্তা নন। তাঁর সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হবে এবং সে সাক্ষাতের দিনটির জন্য আমরা উদগ্রীব। সারাজীবন ধরে আমরা চেষ্টা করে যাই যেন সে সাক্ষাৎ আনন্দময় হয়। একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর ﷺ-এর কাছে এসে বলেন, 'আমি দু'আ করি যেন জীবনের শেষ দিনটি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন হয়।' রাসূল ﷺ হেসে উত্তর দেন, 'এটা তো খুবই ভালো দু'আ।' যে সারাজীবন আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন থাকে, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহর সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেয়, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করে এবং ভুল করে ফেললে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর অবাধ্যতা করে না, অহংকারী ও পাপাচারী নয়, আল্লাহর ক্ষমা লাভের আশা করে এবং তাঁরই ওপর ভরসা করে; সে ব্যক্তির জন্য সে দিনটিই হবে জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন। আল্লাহর ক্ষমা লাভের ব্যাপারে হতাশ হওয়া আসলে তাঁর ক্ষমার সিফাতকে অস্বীকার করার সমতুল্য। তাই এটা কুফর। একজন মুসলিম দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর ক্ষমা লাভের আশা রাখে এবং বিশ্বাস করে যে, এটাই মুক্তিলাভের একমাত্র উপায়।

নবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর সাথে সম্পর্ক

আপনার সন্তানকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিচয় দান করুন। যেসব মুসলিম তাদের নিজ নেতাকে চেনে না তারা আসলেই বড় দুর্ভাগা। আপনার সন্তানকে এমনভাবে গড়ে তুলুন যেন মানবজাতির আদর্শ সেই মহামানব রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে সে অন্যদেরকে জানাতে পারে এবং তাঁর ব্যাপারে তাদের চোখ খুলে দিতে পারে। ইসলামের মূল ভিত্তি দুটি:

১. কোনো রকম অংশীদার স্থাপন ব্যতীত এক আল্লাহর ইবাদাত করা,

২. সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর নিঃশর্ত আনুগত্য করা।

মুহাম্মাদ ﷺ হলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতির প্রতি এক বিশাল রহমত। আল্লাহ ﷻ বলেন,

‘আল্লাহ ঈমানদারদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে নবী পাঠিয়েছেন। যিনি তাদের জন্য আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনান। তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও কাজের কথা শিক্ষা দেন। বস্তুত তারা ছিল পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট।’ [সূরা আলে-ইমরান; ৩:১৬৪]

ঈমানের পথে আমার যাত্রার একটি বড় মাইলফলক ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবন সম্পর্কে জানা। এরপর আমার হৃদয়ে তাঁর প্রতি ভালোবাসার বীজ বপিত হয় এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁকে অনুসরণ করার ইচ্ছে জাগে। এর শুরুটা হয়েছিল মার্টিন লিংস (আবু বকর সিরাজ আদ-দীন: ২৪ জানুয়ারি, ১৯০৯ - ১২ মে, ২০০৫) এর বই ‘মুহাম্মাদ: হিজ লাইফ বেইজড অন দি আরলিয়েস্ট সোর্সেস’ পড়ার মাধ্যমে। দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্বন্ধে মুসলিম এবং অমুসলিমদের লেখাগুলোর মধ্যে বড় ধরনের একটি পার্থক্য থাকে। রাসূলুল্লাহর ﷺ-এর জীবন নিয়ে অমুসলিম ঐতিহাসিকদের লেখা অনেক ভালো ভালো বই আছে। কিন্তু

এগুলো পড়েই আপনি বুঝতে পারবেন যে, লেখাটি একজন অমুসলিমের। কারণ তার লেখার ধরন নেহাত ইতিহাস লেখার মতো। শেইখ আবু বকর সিরাজ আদ-দীনকে আল্লাহ ﷻ জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন এবং তাঁর লিখিত সীরাতটি কবুল করুন। এ বইটি রাসূলুল্লাহর ﷺ-এর জীবনকে ধারাবাহিকভাবে জানার সুযোগ করে দিয়েছিল। যদিও শৈশবে আমি মাদ্রাসার ছাত্র ছিলাম, তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে অপরিচিত কেউ ছিলেন না। কিন্তু সত্যি বলতে, এ বই পড়ার আগে আমি রাসুলুল্লাহর ﷺ-এর সম্পূর্ণ জীবনী কখনো পড়িনি। আগে কেন পড়িনি সে আফসোস আমার এখনও রয়ে গিয়েছে। আমি যদি আমার শৈশবে বা যৌবনে জীবনীটা পড়তাম, তাহলে কতই না ভালো হতো!

সীরাহ বা রাসুলুল্লাহর ﷺ-এর জীবনী হচ্ছে কুরআনের ব্যবহারিক রূপ। অথচ এখনও পর্যন্ত কোনো এক অজানা কারণে আমাদের মাদ্রাসাগুলোতে সীরাহ-কে তেমন গুরুত্বের সাথে পড়ানো হয় না। মাদ্রাসার শিক্ষাক্রমে এ ঘাটতির কারণ আমি আজও বুঝে ওঠতে পারিনি।

এখানে রাসূলুল্লাহর জীবনীর বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। তবে আমি সংক্ষেপে এ মহান মানুষটির পরিচয় দিতে চাই বর্তমান পৃথিবীতে যার অনুসারীর সংখ্যা প্রায় দেড় বিলিয়ন। এ অসাধারণ ব্যক্তিত্বের সবচেয়ে সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন উম্ম মা'বাদ নামে এক বেদুইন মহিলা। মদিনায় হিজরতের পথে এ মহিলার সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর رضي الله عنه-এর দেখা হয়।

এ মহিলার স্বামী সে সময় দূরে ভেড়া চরাতে গিয়েছিলেন। তিনি ফিরে আসার পর ভদ্র মহিলা তার কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যে বর্ণনা দেন তা আজও পর্যন্ত তাঁর সবচেয়ে অনুপুঙ্খ বর্ণনা। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন,

'তিনি ছিলেন উজ্জ্বল এক পুরুষ। সুন্দর গড়ন, সুদর্শন চেহারা, ছিপছিপে শরীর। মাথাখানা মধ্যম গড়নের, খুব বেশি ছোট নয়। দেখতে অভিজাত, সুপুরুষ। চোখ দু'টো ঘন-কালো। পাপড়িগুলো টানা টানা। বুদ্ধিদীপ্ত ও ভরাট কণ্ঠস্বর। ভ্রূযুগল উঁচু, ধনুকের ন্যায় বাঁকানো। পরিপাটি চুল। প্রশস্ত গ্রীবা, ঘন লম্বা শ্মশ্রু। নীরবতা তাঁর মর্যাদা প্রকাশ করতো। আর তাঁর কথার মধ্যে আছে

প্রগাঢ় বুদ্ধিমত্তার ছাপ। কথাগুলো ছিল চিত্তাকর্ষক ও সুদৃঢ়; সাধারণ যেনতেন নয়। প্রতিটি শব্দ যেন সুতোয় গাঁথা মুক্তোর মতো মসৃণ। দূর থেকে দেখলে তাঁকে অত্যন্ত উজ্জ্বল ও আকর্ষণীয় ব্যক্তি মনে হয়। আর কাছ থেকে দেখলে তাঁকেই লাগে সবচেয়ে সুদর্শন। উচ্চতা ছিল মাঝারি; খুব লম্বাও মনে হয় না, আবার খাটোও মনে হয় না। বাকি দু'জনের মাঝে তাঁকে মনে হচ্ছিল উঁচু বৃক্ষের শাখার মতো; তিনজনের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে সুদর্শন; সবচেয়ে সুন্দর আকৃতির। তিনি ছিলেন তাঁর সঙ্গীদের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু। তিনি কিছু বললে তারা মনোযোগ দিয়ে শুনতো। আর তিনি আদেশ করা মাত্রই তা পালনে তারা ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠতো। না কেউ তাঁর বিরোধিতা করেছে, না তিনি কখনো মুখ গোমড়া করেছেন। বরং সবাই তাঁর সাহায্যে তৎপর থাকত, আন্তরিকভাবে তাঁর সেবা করতে চাইত।'

দাদা আবদুল মুত্তালিব তাঁর নাম রেখেছিলেন 'মুহাম্মাদ', যার অর্থ হলো 'প্রশংসিত'। আল্লাহ তাঁর নামের অর্থকে পূর্ণতা দান করেছেন। তাঁর মতো প্রশংসা আর কারও করা হয় না। গোটা বিশ্ব জুড়ে দিনরাত তাঁর প্রশংসা হতে থাকে।

সেসময় প্রচলন ছিল, মক্কাবাসীরা জন্মের পরপরই তাদের বাচ্চাদেরকে মরুভূমির বেদুইনদের কাছে পাঠিয়ে দিত। সেখানকার পরিবেশ স্বাস্থ্যকর ছিল এবং বেদুইনদের ভাষাও ছিল তুলনামূলক বিশুদ্ধ। আরবের অধিবাসীরা বাচ্চাদের সদাচরণ এবং মূল্যবোধ শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে সচেতন ছিল। তারা তাদের ভাষা এবং সংস্কৃতির ব্যাপারেও ছিল খুব সংবেদনশীল। তারা চাইত যেন বাচ্চারা আরবের শুদ্ধ ভাষা-সংস্কৃতি ও আদব-কায়দা শিখতে পারে। তাই তারবিয়্যাহ (শিক্ষা এবং প্রতিপালন)-এর জন্য তারা বাচ্চাদের বেদুইন গোত্রগুলোর কাছে পাঠিয়ে দিত।

মক্কাবাসীরা মক্কায় তাদের শিশুদের বেড়ে ওঠা নিয়ে চিন্তিত ছিল। কারণ তীর্থস্থান এবং বাণিজ্যিক কেন্দ্র হওয়ায় মক্কায় প্রচুর অনারব এবং বিদেশী লোকের সমাগম থাকত। এছাড়াও বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষ মক্কায় পাড়ি জমাত। তাই মক্কা বাচ্চাদের বেড়ে ওঠার জন্য খুব একটা স্বাস্থ্যকর জায়গা ছিল না। এর তুলনায় মরুভূমি ছিল অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর। আর আচার-আচরণ

ও ভাষা-সংস্কৃতি ভালোভাবে শেখার জন্যও মরু অঞ্চলের পরিবেশ ছিল অনেক বেশি উপযোগী। এসব কারণেই মক্কার অভিজাত পরিবারগুলো তাদের সদ্যপ্রসূত বাচ্চাদের পরিচর্যা এবং লালন-পালনের জন্য মরুভূমির বেদুইন কোনো মহিলাদের কোলে তুলে দিত।

অন্যের সন্তান প্রতিপালন ছিল সেসব গোত্রের মহিলাদের আয়ের একটি অন্যতম উৎস। তাই তারাও শহুরে লোকদের বাচ্চা নিতে আগ্রহী ছিল। তারা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এ বাচ্চাদের দেখভাল করতো। এভাবেই মক্কাবাসী ও বেদুইনদের মাঝে একটি সম্পর্কের সেতুবন্ধন তৈরি হয়। প্রয়োজনে বেদুইনরা সেসব ধনী ব্যবসায়ী ও অভিজাত গোত্র প্রধানদের ওপর নির্ভর করতো, যারা শৈশবে তাদের ঘরেই বেড়ে উঠেছিলেন। মুহাম্মাদ ﷺ-এর ক্ষেত্রেও এমনটা ঘটেছিল। তিনি বনু সা'দ গোত্রে বেড়ে উঠেছিলেন। তাঁর দুধ-মা'র নাম ছিল হালিমা সা'দীয়্যা। তিন বছর বয়স পর্যন্ত তিনি তাদের সাথে ছিলেন। যেহেতু শহুরে বাচ্চাদের শৈশব কাটত তাদের বেদুইন দুধ-ভাইবোনদের সাথে, ফলে তাদের মাঝে আজীবনের জন্য একটা সম্পর্ক তৈরি হয়ে যেত।

হুনায়নের যুদ্ধে আটককৃত এক বেদুইন মহিলার ব্যাপারে সীরাহ গ্রন্থগুলোতে একটি বিখ্যাত ঘটনা বর্ণিত আছে। আটককৃত সে মহিলাটি নিজেকে রাসূলুল্লাহর ﷺ-এর বোন বলে দাবি করে। প্রথমে কেউ তার কথা পাত্তা না দিলেও সে বার বার একই কথা বলতে থাকে। একসময় তাকে মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। সাহাবাদের অবাক করে দিয়ে মহিলাটি কোনো রকম শ্রদ্ধাসূচক সম্বোধন ছাড়াই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নাম ধরে ডেকে বলে, 'আমি তোমার বনু সা'দ গোত্রের বোন। তুমি কি আমায় চিনতে পারছো না?' রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে চিনতে না পেরে প্রমাণ দেখাতে বলেন। তখন মহিলাটি তার জামার হাতা গুটিয়ে হাতে একটা দাগ দেখিয়ে বলে, 'তুমি যখন ছোট্ট ছিলে তখন একদিন আমার কোলে থাকা অবস্থায় হাতে কামড়ে দিয়েছিলে। এটা তারই দাগ।' তৎক্ষণাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে চিনতে পারেন এবং হাসিমুখে তাকে সমাদর করে বসতে বলেন। তারপর তাঁরা অনেকক্ষণ তাদের সে 'পরিবার'-এর কথা আলোচনা করেন এবং শৈশবের স্মৃতিচারণ করেন।

বনু সা'দ গোত্র থেকে মক্কায় ফিরে আসার পর মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর দাদার তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠেন। দাদার মৃত্যুর পর চাচা আবু তালিব তাঁর অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন। তখনকার অধিকাংশ শিশুর মতো তিনিও বেশ কয়েক বছর মেষপালকের কাজ করেন। ফলে তাঁকে ঘরের বাইরে অনেক সময় কাটাতে হয়েছে। তিনি বিশুদ্ধ আরবি ভাষায় কথা বলা শিখেছিলেন। তিনি অত্যন্ত বাগ্মী ছিলেন; তবে তিনি লিখতে বা পড়তে জানতেন না। কারণ, তখন লেখাপড়া শেখার খুব একটা প্রচলন ছিল না। কোনোকিছু লেখা বা পড়ার প্রয়োজন হলে মানুষ পেশাদার লিপিকারদের কাছে যেত। একারণেই মুহাম্মাদ ﷺ-কে উম্মি বা 'নিরক্ষর নবী' বলা হয়।

যারা দাবি করে যে, কুরআন মুহাম্মাদ ﷺ-এর রচিত, তাদের বিরুদ্ধে এটি একটি বড় প্রমাণ। কুরআন হচ্ছে আসমানী গ্রন্থ। নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর রচয়িতা নন।

মূল প্রসঙ্গ থেকে একটু দূরে সরে গেলেও আমি মনে করি, মেষ চরানোর মাধ্যমে নবী ﷺ জীবনের যে শিক্ষাগুলো লাভ করেছিলেন তা আলোচনা করা উপকারী হবে। মুহাম্মাদ ﷺ বনু সা'দ গোত্রে থাকাকালীন অধিকাংশ সময় জুড়ে মেষ চরিয়েছেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে আল্লাহর অধিকাংশ নবীই জীবনের কোনো এক সময়ে মেষ চরিয়েছেন। ঈসা عليه السلام একবার মানুষের নেতৃত্ব দেওয়া সম্পর্কে বলতে গিয়ে মেষ চরানোর উপমা দিয়েছিলেন। সত্যি বলতে, মেষ চরানো থেকে অনেক কিছু শেখার আছে।

মেষপালক হওয়ার মাঝে নেতৃত্বের যে শিক্ষাগুলো নিহিত আছে সেগুলোর কয়েকটি নিচে বর্ণনা করা হলো:

১. দায়িত্ববোধ এবং জবাবদিহিতা

> রাসূল ﷺ বলেছেন, 'তোমাদের প্রত্যেকেই একজন রাখাল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।'

প্রত্যেক রাখালকেই তার মালিকের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। রাখাল তার আধীনে থাকা ভেড়ার ব্যাপারে দায়িত্বশীল। কোনোটি যদি হারিয়ে যায় বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে অবশ্যই এর দায়-দায়িত্ব তার ওপরেই বর্তায়। 'আমার কী করার আছে, বা এগুলো একেবারেই অপদার্থ'—এ জাতীয় কোনো যুক্তিতর্ক উপস্থাপনের সুযোগ তার থাকে না। ভেড়াগুলো যতই ধূর্ত বা বেয়াড়া হোক না কেন, রাখালই তাদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল।

২. ধৈর্য, দয়া ও মমতা

ভেড়ার মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা অন্য কোনো প্রাণীর মধ্যে নেই। ভেড়ারা অনেক বেশি অলস। এরা ঢিলা ও দুর্বল প্রকৃতির। অলস ভঙ্গিতে এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়ায়। এরা সহজেই বিভ্রান্ত হয়। একারণে অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে এদের বেশি যত্নের প্রয়োজন পরে। উট, ঘোড়া কিংবা গরু-ছাগলের চেয়ে ভেড়ার বিপদে পড়ার সম্ভাবনা বেশি। তাদের মধ্যে শত্রুর বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধের স্বভাব নেই। শত্রু প্রাণী কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে একটি বিপদে পড়লে অন্যগুলো এগিয়ে আসে না, বরং দৌড়ে পালায়। আবার তাদেরকে কঠিন শাস্তিও দেওয়া যায় না। কেননা তা সহ্য করার মতো ক্ষমতা তাদের নেই। কাজেই, মেষপালককে অনেক ধৈর্যশীল, সচেতন, সদয় ও মমতাবান হতে হয়। অন্যথায় ভেড়াগুলো হারিয়ে যাবে কিংবা মরে যাবে।

অন্যদিকে উট উদ্ধত স্বভাবের প্রাণী। তাই তাদের সাথে কঠোরতা অবলম্বন করতে হয় এবং বল প্রয়োগ করে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। একারণে উটের রাখালরা সাধারণত কর্কশ এবং কঠোর স্বভাবের হয়ে থাকে। কেননা উট সামলাতে এরকম আচরণই এর সাথে করতে হয়। এভাবেই একজন মানুষের পেশাগত কাজের প্রভাব তার ব্যক্তিত্বের ওপরেও পড়ে। ডাক্তারদের হাতের লেখা হিজিবিজি হয়। শিক্ষকরা সাধারণত বিজ্ঞ প্রকৃতির হয় এবং তাদের কথাবার্তায় থাকে পাণ্ডিত্যের ছাপ। মিস্ত্রীদের ব্যক্তিত্ব কৃষকদের মতো হয় না। কারণ, কৃষকদের কাজ মাটি এবং গাছপালা নিয়ে। প্রকৌশলী, রাজনীতিবিদ, উকিল, পুলিশ প্রত্যেকেরই ব্যক্তিত্ব ভিন্ন ভিন্ন রকম। কাজেই, পেশা নির্বাচনের ক্ষেত্রে আপনাকে সতর্ক

থাকতে হবে। এমন পেশা গ্রহণ করবেন যা দ্বীন ইসলামের সাথে মানানসই হয় এবং দ্বীন পালনে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। সাহাবাগণও বিভিন্ন প্রশাসনিক দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ ধরনের পেশায় তারা দৃষ্টান্তমূলক আদর্শ স্থাপন করেছেন। রাজনীতির নোংরামী বা প্রশাসনের অসুস্থতা তাদেরকে সামান্যতম স্পর্শ করতে পারেনি। মেষপালককে তাই ধীশক্তি সম্পন্ন হতে হবে। অধীনস্থদের ব্যাপারে সহনশীল হতে হবে। নবী মূসা (আঃ) দশ বছর এ দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এর মধ্য দিয়েই তিনি লাভ করেছিলেন বনী ইসরাঈলের মতো একটি বেয়াড়া জাতিকে নেতৃত্ব দেওয়ার প্রশিক্ষণ। অন্যান্য নবীদের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

৩. সাহসিকতা

একজন মেষপালককে অবশ্যই সাহসী হতে হবে। কেননা তার কাঁধেই ভেড়াদের নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব। তাকে বিপদাপদ সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে এবং তা থেকে ভেড়াদের রক্ষা করার উপায় জানা থাকতে হবে। ভেড়াদের রক্ষা করতে গিয়ে অনেক সময় নিজেই শত্রুর হুমকির সম্মুখীন হতে পারে। এ ব্যাপারটি মাথায় রেখে রাখালকে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। কারণ ভেড়াগুলোতো নিজেদেরই রক্ষা করতে পারে না, রাখালকে রক্ষা করাতো অনেক দূরের ব্যাপার। বিপদ সম্পর্কে ভেড়ার রাখালকে আগে থেকেই ধারণা রাখতে হবে এবং সে অনুসারে প্রস্তুত থাকতে হবে। তাকে চিন্তায় সৃষ্টিশীল হতে হবে। আচমকা আসা কোনো বিপদ কাল হয়ে দাঁড়াবার আগেই তার সমাধান বের করে ফেলতে হবে। ভেড়াদের মধ্যে সহজেই দল থেকে বিচ্ছিন্ন হবার প্রবণতা থাকে। তাই একপাল ভেড়াকে নিয়ন্ত্রণে রাখা খুবই কষ্টের কাজ। কাজেই ভেড়ার রাখালকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হয় এবং ভেড়াগুলোকে ভালো করে চিনে রাখতে হয়; যেন হারিয়ে গেলেও সে আবার খুঁজে বের করতে পারে।

৪. উদ্বেগ ও স্নেহ-মমতা

ভেড়ার পালকে নিয়ে গিয়ে খাওয়াতে হয়। খাবারটুকু পর্যন্ত নিজেরা খুঁজে খায় না। না খাওয়ালেও এরা বসে থাকে। এমনকি এভাবে একসময় ক্ষুধায় মারা যায়। আবহাওয়া যেমনই হোক না কেন, তাদেরকে খাবারের জন্য চারণভূমিতে নিয়ে যেতে হয় অথবা বিকল্প কোনো ব্যবস্থা করতে হয়। রাখালের নিজের খাওয়ার আগে ভেড়ার খাওয়া নিয়ে ভাবতে হয়। তাদের স্বাস্থ্য নিয়েও চিন্তা করতে হয়। কোনোটা অসুস্থ হয়ে পড়লে রাত জেগে তার দেখাশোনা করতে হয়। ভেড়া খুবই কোমল প্রকৃতির প্রাণী এবং সহজেই আঘাত পায়। কাজেই রাখালকে তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে। চলার পথ কষ্টকর হলে সাহায্য করতে হবে। প্রয়োজনে কোলে-পিঠে করে হলেও তাদেরকে বইয়ে নিতে হবে। রাখালদের অনেক সময়ই মেষ-শাবককে কাঁধে নিতে দেখা যায়। কারণ নিজের পায়ে হাঁটার মতো শক্তি সে শাবকের তখনও হয়নি।

৫. দূরদৃষ্টি

ভেড়া আকার-আকৃতি ও উচ্চতায় খুব ছোট প্রাণী, তাই খুব দূরে সে দেখতে পায় না। সামনের বিপদ-আপদ আগে থেকে টের পায় না। কিন্তু ভেড়ার রাখালতো তা দেখতে পায়। সে দূর থেকেই বিপদ টের পায় এবং ভেড়াকে সতর্ক করতে পারে। কোন্ কাজের ফল কী হতে পারে তা নবীগণ তাঁদের দূরদৃষ্টির সাহায্যে আগেই বুঝতে পারতেন। অন্যেরা বিষয়টি অনুধাবন না-ও করতে পারে। রাখালই একমাত্র জানে যে, তার মেষপালকে কোথায় নিয়ে যেতে হবে। ভেড়া সেদিকেই যাবে রাখাল যেদিকে পথ দেখাবে, যদিও তা ভুল হয়। এ কারণেই প্রথমেই ভেড়ার রাখালকে তার গন্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখতে হবে।

৬. সহজ-সরলতা

একজন মেষপালকের জীবন মাত্রই হবে সহজ-সরল, সাধারণ। অনাড়ম্বর এবং বাহুল্য বর্জিত। তার সকল জিনিস তাকেই বহন করে বেড়াতে হয়। কারণ, ভেড়ারা তো আর তার জিনিস বহন করতে পারে না। কাজেই তাকে হতে হয় হালকা ছিমছাম। শারীরিকভাবে শক্তসামর্থ্য এবং কষ্ট সহিষ্ণু। ঘুম কাতুরে হলে চলবে না তাকে। কেননা, রাতে তাকে প্রায়ই ঘুম থেকে ওঠে ভেড়াদের ওপর নজর রাখতে হয়। আবার ভোর হওয়া মাত্রই ঘুম থেকে ওঠে ভেড়ার পাল নিয়ে চারণভূমিতে যেতে হয়। বেশি সময় ধরে ঘুমোলে ভেড়াগুলো তাকে রেখেই এদিক-সেদিক চলে যাবে এবং বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে।

৭. প্রকৃতির সান্নিধ্য

রাখালদের জীবন সাধারণত আল্লাহর সৃষ্টির সংসর্গে কাটে। অনেক ক্ষেত্রেই এমন হয় যে—রাখালেরা তাদের ভেড়ার পাল নিয়ে বের হয়, এক চারণভূমি থেকে আরেক চারণভূমিতে পাল নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তাঁবু খাটিয়ে সেখানে বসবাস করে। মাসের পর মাস তাদের ঘরে ফেরা হয় না। তাদের একমাত্র সঙ্গী হয়ে থাকে এ ভেড়াগুলো। তাই নিঃসঙ্গতা ও নিজের কাজে ব্যস্ত থাকাকে ভালোবেসে নিতে হয়। ভাবনার অতল গভীরে ডুব দেওয়ার জন্য একজন মেষপালকের প্রচুর সময় হাতে থাকে। এখান থেকে ওখানে ঘনঘন ছোটাছুটির ব্যস্ততা নেই। তাই নিজেকে জানার জন্য থাকে অবারিত সময়। প্রকৃতির কাছাকাছি থাকার সবচেয়ে বড় আনন্দ হলো আকাশের তারা দেখা, প্রাকৃতিক খাদ্য দিয়ে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা মেটানো এবং মাটিতে গা ছড়িয়ে শুয়ে থাকা। কান পেতে প্রকৃতির নীরবতা শোনা যায়, অন্ধকারে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতে শেখা যায়, মন থেকে অন্ধকারের ভয় হারিয়ে যায়। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তে বৈচিত্র্যময় নিখুঁত সৃষ্টির মাঝে মহিমান্বিত আল্লাহর নিদর্শন খুঁজে পাওয়ার মাধ্যমে রবের সাথে তার গড়ে ওঠে এক একান্ত নিবিড় সম্পর্ক।

এগুলোই হলো ভেড়া চরানোর মাধ্যমে অর্জিত গুণাবলী। আক্ষরিক অর্থে যদিওবা এ কাজটি আমরা নিজেরা করছি না, তবুও আমাদের নিজেদের প্রশ্ন

করা উচিত—এ গুণগুলোর কয়টি আমাদের মাঝে আছে? এ গুণগুলো অর্জনের জন্য আমরা চেষ্টা করছি তো?

আমাদের মূল আলোচনায় ফিরে আসি। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বয়স পঁচিশ বছর, তখন তিনি মহীয়সী নারী খাদিজা ؓ-এর পক্ষ থেকে বিয়ের প্রস্তাব পেলেন। খাদিজা ؓ ছিলেন মক্কার একজন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী। তিনি মুহাম্মাদ ﷺ-কে তাঁর ব্যবসা পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। বাণিজ্য-বহর নিয়ে মুহাম্মাদ ﷺ যখন শামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, সে সময় খাদিজা ؓ তার গোলাম মায়সারাকে সাথে দিয়ে দেন। মায়সারার দায়িত্ব ছিল মুহাম্মাদ ﷺ-কে সাহায্য করা এবং সফরের যাবতীয় বিষয় খাদিজা ؓ -কে অবগত করানো। মায়সারা মুহাম্মাদ ﷺ-এর সততা, সদাচরণ, জ্ঞান এবং তীক্ষ্ণ ব্যবসায়িক বুদ্ধি দেখে এত বেশি মুগ্ধ হয় যে, ফিরে এসে খাদিজা ؓ-কে সেসব ব্যাপারে জানায়। খাদিজা ؓও মুগ্ধ হন এবং তিনি মুহাম্মাদ ﷺ-এর চাচার কাছে তার বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। মুহাম্মাদ ﷺ তাতে সম্মতি প্রকাশ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল পঁচিশ বছর এবং খাদিজা ؓ-এর বয়স ছিল চল্লিশ বছর।

খাদিজা ؓ-এর মৃত্যু পর্যন্ত তারা একত্রে পঁচিশ বছর সংসার করেন। মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর প্রতি খুবই অনুরাগী ছিলেন। খাদিজা ؓ ছিলেন মুহাম্মাদ ﷺ-এর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত সঙ্গী এবং প্রিয়তম বন্ধু। হেরা গুহায় প্রথম ওয়াহী লাভ করার সময় জিবরীল ؑ-এর আসল রূপ দেখে মুহাম্মাদ ﷺ অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তখন তিনি তাঁর স্ত্রী খাদিজা ؓ-এর কাছে ছুটে যান। খাদিজা ؓ-এর সাথে পঁচিশ বছরের সংসারের এ সুদীর্ঘ সময়ে তিনি আর অন্য কাউকে বিয়ে করেননি। যায়নাব, রুকাইয়া, উম্ম কুলসুম, ফাতিমা, কাসিম, আবদুল্লাহ—এরা সকলেই ছিলেন খাদিজা ؓ-এর গর্ভজাত সন্তান। এদের মধ্য থেকে কেবল ফাতিমা ও আলী ؓ-এর ঘরে জন্ম নেওয়া বংশধররাই পরবর্তী সময়ে বেঁচে ছিলেন।

আপনার শিশুকে বই পড়তে উৎসাহিত করুন। ইসলামের প্রাচীন গ্রন্থসমূহের সাথে তাকে পরিচয় করিয়ে দিন। গাড়ির ক্ষেত্রে ড্রাইভিং যেমন গুরুত্বপূর্ণ, ভাষার ক্ষেত্রেও অক্ষর জ্ঞান তেমন। আমার দৃষ্টিতে, মানব সভ্যতার উন্নয়নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপটি হলো ভাষার ক্রমবিকাশ। এটি এমন এক মাধ্যম যাতে মানুষ

তার চিন্তা-ভাবনাগুলো সংরক্ষণ করে রাখতে পারে এবং অন্যদের শেখায়। অন্যদের ইতিহাস থেকে আমরা শিখি, আর আমাদের ইতিহাস থেকে শিখবে পরবর্তী প্রজন্ম। এমনকি ভাষার মাধ্যমে অনাগত প্রজন্মের সাথেও ভাব বিনিময় করতে পারি আমরা। ভাষা টিকে থাকে যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। এটি যেন অমরত্ব লাভের এক মহৌষধ। মূলত অক্ষর জ্ঞান তথা ভাষা লিখতে-পড়তে পারার যোগ্যতাই আমাদের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। একারণেই অক্ষর জ্ঞান বর্তমান যুগে অন্ন-বস্ত্রের মতোই অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে, সত্যি বলতে এগুলো থেকেও গুরুত্বপূর্ণ।

বড়রা যখন ছোটদের লিখতে-পড়তে শেখায়, প্রকৃতপক্ষে তারা মনুষ্যত্বের ধারাবাহিকতায় তাদেরকে নিয়ে আসে। এর মাধ্যমে মানবজাতির সামষ্টিক জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য উপযোগী করে তুলে তাদেরকে। যে সমাজ শিশুদের লেখা-পড়া শেখায় না, তারা জ্ঞানের মতো মহা মূল্যবান সম্পদ অর্জনে পেছনে পড়ে থাকে। সামনে এগিয়ে যাবার একমাত্র পথ রুদ্ধ হয়ে যায় তাদের জন্য। রুদ্ধদ্বারে শিশুরা নীরব সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এ নির্মম সত্যের সাক্ষী হয়ে যে, এর চাবি যাদের হাতে ছিল তারা তা তাদের হাতে তুলে দেয়নি। এর চেয়ে দুঃখজনক আর কিছুই হতে পারে না।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নিরক্ষরতা যেন শিশুদের নিয়তি। এর জন্য দায়ী পরিবারের দারিদ্রতা এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের অভাব। এসব দেশে যেসব প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল আছে সেগুলোর ব্যবস্থাপনা খুবই দুর্বল, সুযোগ-সুবিধা একেবারেই অপ্রতুল এবং শিক্ষার মান অতি নিম্ন। বয়স্ক নিরক্ষরদের জন্য লেখাপড়ার সুযোগ নেই বললেই চলে। গ্রামে-গঞ্জে গেলে দেখা যায় কত মেধাবী ও সম্ভাবনাময় শিক্ষার্থীরা লেখা-পড়া বাদ দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ নির্মম বাস্তবতার কারণ হলো পৃষ্ঠপোষকতার অভাব। অধিকাংশ অনুদান ও সাহায্য পুরোপুরি অপ্রয়োজনীয় খাতে চলে যায়। সম্ভাবনাময়ী ছাত্রদের পেছনে অর্থ ব্যয় করার কোনো পরিকল্পনা নেই। এদের অনেককে রাস্তার পাশের হোটেলে বেয়ারা কিংবা বাস-ট্রাকের হেলপার হিসেবে কাজ করানো হয়। আমরা কখনোই জানতে পারবো না, কেবল আমাদের অযত্ন ও উপেক্ষার কারণে আমরা কত সম্ভাবনাময়ী বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী ও

বুদ্ধিজীবীদের হারাচ্ছি। এ ক্ষমাহীন অবহেলা গণহত্যার চেয়েও খারাপ। আমরা সবাই কম-বেশি এমন পরিস্থিতির জন্য দায়ী।

কেবল মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবনী মুখস্থ করলেই চলবে না। আল্লাহর প্রেরিত রাসূল হিসেবে তাঁর মর্যাদা বুঝতে হবে এবং তাঁর আদর্শ গ্রহণ করতে হবে। মুসলিম উম্মাহকে জানতে হবে—রাসূলের সাথে তাদের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত এবং তাঁর ব্যাপারে কেমন বিশ্বাস পোষণ করা উচিত। এ সবকিছুই আকীদার অন্তর্ভুক্ত এবং এগুলোর যে কোনো একটির প্রতি অস্বীকৃতি বা অবিশ্বাস মানুষকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়:

১. প্রথমেই আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে, তিনি একজন মানুষ এবং তিনি আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ নবী ও রাসূল। এটি ইসলামী আক্বীদার একটি মৌলিক বিষয়। কেউ যদি মনে করে যে, মুহাম্মাদ ﷺ-এর পরে অন্য কোনো নবী বা রাসূল আছে, তবে সে আর মুসলিম থাকে না। তাই মুসলিমরা সে সকল ব্যক্তিকে অস্বীকার করে ও মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে যারা মুহাম্মাদ ﷺ-এর পর নবুয়্যতের দাবি তোলে, যেমন—মুসায়লামা আল-কায্যাব, গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী এবং আরও অনেকে। যারা এদেরকে নবী মনে করে তারাও নিঃসন্দেহে অমুসলিম তথা কাফের। মুহাম্মাদ ﷺ হচ্ছেন সর্বশেষ রাসূল। তিনি হচ্ছেন নবুয়্যতের সীলমোহর। তাঁর পরে আর কোনো নবী বা রাসূল আসবেন না। তিনি দ্বীনের পূর্ণতা প্রাপ্তির প্রমাণ এবং তার পরে আল্লাহ আর নতুন কিছু নাযিল করবেন না। আর এ বিধানের স্থান পূর্বে নাযিলকৃত অন্য সকল বিধানের উর্ধ্বে। এ ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ বলেন,

'মুহাম্মাদ তোমাদের কোনো ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত।' [সূরা আল আহ্যাব; ৩৩:৪০]

২. মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর ওয়াহি নাযিল প্রসঙ্গে আল্লাহ ﷻ বলেছেন,

'নক্ষত্রের শপথ, যখন অস্তমিত হয়। তোমাদের সঙ্গী পথভ্রষ্ট হননি এবং বিপথগামীও হননি। এবং প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না; তা তো কেবল ওয়াহি, যা প্রত্যাদেশ হয়। তাঁকে শিখিয়েছেন এক শক্তিশালী ফেরেশতা, সহজাত শক্তিসম্পন্ন; এবং সে নিজ আকৃতিতে প্রকাশ পেল। ঊর্ধ্ব দিগন্তে, অতঃপর নিকটবর্তী হলো ও

ঝুলে গেল। তখন দুই ধনুকের ব্যবধান ছিল অথবা আরও কম। তখন আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করবার তা প্রত্যাদেশ করলেন। রাসূলের অন্তর মিথ্যা বলেনি যা সে দেখেছে।' [সূরা আন নাজম; ৫৩:১-১১]

> ৩. তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়োজিত একজন আইনদাতা। হালাল হারাম ঘোষণার ব্যাপারে অনুমতিপ্রাপ্ত। তাঁর আদেশ প্রশ্নাতীতভাবে মানতে হবে এবং তাঁর কোনো রকম বিরুদ্ধাচরণ করা যাবে না। এটা ঈমানের একটি শর্ত, অন্যথায় তা ঈমান ভঙ্গের কারণ হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ ﷻ বলেন,

'তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক হিসেবে মেনে নেয়। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজেদের মনে কোনো রকম সংকীর্ণতা বোধ না করে এবং তা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেয়।' [সূরা আন নিসা; ৪:৬৫]

'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো কাজের আদেশ করলে কোনো ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে নিজেদের থেকে ভিন্ন কোনো মত থাকার সুযোগ নেই। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়।' [সূরা আল আহ্যাব; ৩৩:৩৬]

'যখন তাদের মধ্যে ফায়সালা করার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয়, তখন তাদের একমাত্র কথাই হলো এই যে, আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম; তারাই সফলকাম।' [সূরা আন নূর; ২৪:৫১]

'তিনি মনগড়া কোনো কথা বলেন না। কুরআন ওয়াহি, যা প্রত্যাদেশ হয়।' [সূরা আন নাজম; ৫৩:৩-৪]

'যে রাসূলের হুকুম মান্য করলো সে আল্লাহরই হুকুম মান্য করলো। আর যে লোক বিমুখ হলো, আমি আপনাকে (হে মুহাম্মাদ) তাদের জন্য রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করে পাঠাইনি।' [সূরা আন নিসা; ৪:৮০]

'বলুন, আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তার ওপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্য সে দায়ী এবং তোমাদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী। তোমরা যদি তাঁর আনুগত্য করো, তবে সঠিক পথ পাবে। রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টরূপে পৌঁছে দেয়া।' [সূরা নূর; ২৪:৫৪]

'যারা কুফুরী এবং রাসূলের নাফরমানী করেছিল, তারা সেদিন কামনা করবে—আহ! যদি তাদেরকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হতো! তারা আল্লাহর নিকট কোনো কিছুই লুকোতে পারবে না।' [সূরা নিসা; ৪:৪২]

'তারাই মুমিন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহর পথে জান-মাল দিয়ে জিহাদ করে; তারাই সত্যনিষ্ঠ।' [সূরা আল হুজুরাত; ৪৯:১৫]

সমগ্র কুরআনে এমন কোনো আয়াত খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেখানে 'আল্লাহর আনুগত্যের' কথা বলা হয়েছে অথচ 'রাসূলের আনুগত্যের' কথা বলা হয়নি। কেননা, রাসূলের আনুগত্য বাদ দিয়ে আল্লাহর আনুগত্য কখনোই সম্ভব নয়। কুরআনে যতবার আল্লাহর আনুগত্যের কথা বলা হয়েছে প্রতিবারই তার সাথে রাসূলের আনুগত্যকে শর্ত রূপে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো, কারও যেন এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ না থাকে যে, আল্লাহর আনুগত্য মানেই রাসূলের আনুগত্য, রাসূলের আনুগত্য ছাড়া আল্লাহর আনুগত্য কখনোই পূর্ণতা লাভ করতে পারে না।

উল্লিখিত আয়াতসমূহ থেকে এটা স্পষ্ট যে, সৃষ্টিগত দিক থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন মাটির তৈরি একজন মানুষ। কিন্তু তিনি ছিলেন আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহর নিকট তিনি সর্বাপেক্ষা সম্মানিত। কাজেই কেউ যদি এসব আয়াত থেকে মনে করে যে, মানবীয় গুণাবলীর দিক থেকে রাসূল ﷺ অন্যান্য মানুষের মতোই একজন সাধারণ মানুষ, তবে সে মারাত্মক ভুল করবে।

তিনি মানবীয় গুণাবলীর ঊর্ধ্বে; তিনি মহামানব।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ব্যাপারটি তখন একটি দেশের রাজাকে তার আধীনস্থ নগণ্য এক প্রজার সাথে তুলনা করার মতো হয়ে যাবে। এটা সত্যি যে, সৃষ্টিগত দিক থেকে তারা উভয়েই মানুষ এবং বাহ্যিকভাবেও একই রকম। কিন্তু একজন রাজা কখনো একজন সাধারণ প্রজার মতো নয়। একইভাবে রাসূল ﷺ সৃষ্টিগত দিক থেকে একজন মানুষ হলেও তিনি আল্লাহর সর্বাপেক্ষা প্রিয় বান্দা এবং আমাদের সর্বোচ্চ নেতা।

আর তিনিই বিচার দিবসে তাঁর উম্মাত তথা আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবেন। তিনি হলেন ইমাম-উল-আম্বিয়া (নবীদের নেতা), সায়্যিদুল মুরসালীন (রাসূলদের নেতা), রাহমাতুল্লিল 'আলামিন (বিশ্বজগতের প্রতি রহমত)। তিনি হলেন সে ব্যক্তি যাঁর ওপরে মহাগ্রন্থ আল কুরআন নাযিল হয়েছে। স্বয়ং আল্লাহ তাঁর প্রশংসা করেছেন। ফেরেশতাগণও তাঁর ওপর সালাম প্রেরণ করেন এবং তাঁর ওপর দরুদ পাঠ করেন। আল্লাহ আমাদেরকেও একই কাজ করতে আদেশ করেছেন:

'আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর জন্য রহমতের তরে দোয়া করো এবং তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ করো।' [সূরা আল আহ্যাব; ৩৩:৫৬]

৪. অন্য সকল মানুষের চেয়ে রাসূল ﷺ-কে বেশি ভালোবাসা ঈমানের একটি শর্ত। যে ব্যক্তি এভাবে ভালোবাসবে না, আল্লাহ তাকে শাস্তি দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন,

'বলুন, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা মন্দা হয়ে যাওয়ার ভয় করো এবং তোমাদের বাসস্থান যাকে তোমরা পছন্দ করো—এসব যদি আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা করো আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত; আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।' [সূরা আত তাওবা; ৯:২৪]

তাছাড়া, আল্লাহ রাসূলের সাহাবীগণেরও প্রশংসা করেছেন এবং বলেছেন, তারা আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন। যেমন তিনি বলেন,

'নবী মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের আত্মার চেয়েও অধিক প্রিয় এবং তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মাতা।' [সূরা আল আহযাব; ৩৩:৬]

আর রাসূল ﷺ তাঁর অনুসারীদের কেমন ভালোবাসতেন সে সম্পর্কে আল্লাহ ﷻ বলেন,

'তোমাদের কাছে এসেছেন তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তাঁর কাছে দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়ার্দ্র।' [সূরা আত তাওবাহ; ৯:১২৮]

মুসলিমদের ওপর আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর অধিকারগুলো বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা আমার উদ্দেশ্য নয়। সে আলোচনার জন্য এ বইটি উপযুক্ত স্থান নয়। তবে এতটুকু বলা যথেষ্ট যে, রাসূল ﷺ-ই হলেন দ্বীন ইসলামের কেন্দ্রবিন্দু এবং তাঁর অবদান ও শিক্ষাই হলো দ্বীনের মৌলিক ভিত্তি। তিনি শুধু আল্লাহর বিধান আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েই ক্ষান্ত হননি। তিনি এমন একটি প্রজন্ম তৈরি করে গিয়েছেন যা পরবর্তীতে সকল প্রজন্মের জন্য এক অনুকরণীয় অনন্য দৃষ্টান্ত এবং তাদের গৌরবোজ্জ্বল জীবনধারা হলো আমাদের জন্য আদর্শের এক মানদণ্ড।

স্বয়ং নবী মুহাম্মাদ ﷺ একটি আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি প্রতিষ্ঠিত করে যান—রাষ্ট্র পরিচালনা, রাষ্ট্রনায়কের ভূমিকা এবং ইসলামকে পৃথিবীর প্রতিটি কোণায় ছড়িয়ে দেওয়া সংক্রান্ত যাবতীয় মূলনীতি। তাঁর অনুসারীরা ইসলামকে পৌঁছে দিয়েছেন আরব থেকে আফ্রিকা, এশিয়া, ইউরোপ ও চীন পর্যন্ত প্রত্যেকটি জায়গায়। তাদের মাঝে প্রতিফলিত হওয়া রাসূল ﷺ-এর শিক্ষা এবং জীবনাচরণ হয়ে ওঠেছিল সারা দুনিয়ার জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। তারা ছিলেন ইসলামের জীবন্ত উদাহরণ। কোনো জোরাজুরি নয়, বরং আল্লাহর রাসূলের সাহাবীদের উত্তম আখলাকে মুগ্ধ হয়ে ভালোবেসে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন জনপদের মানুষ ইসলামকে গ্রহণ করে নিয়েছে।

বর্তমান যুগ এক ভয়ংকর ফিত্নার যুগ। আজকাল পবিত্র ও ধর্মীয় বিষয়কে অবজ্ঞা এবং তাচ্ছিল্যের চোখে দেখা হয়। আল্লাহর নবীদের সম্পর্কে কটূক্তি ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়। এ অবস্থায় অধিকাংশ অমুসলিমের পক্ষে এটা বোঝা প্রায় দুঃসাধ্য যে, কী করে মুসলিমরা এমন একজন মানুষকে এতো ভালোবাসে যাকে তারা কোনোদিন দেখেনি! যিনি তাদের দেশ, জাতি, গোত্র বা বংশের কেউ নন! যিনি এসেছিলেন আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে। মুসলিমরা তাঁকে শুধু মুখেই ভালোবাসে না, বরং তাঁর নাম ও সম্মানের জন্য জীবন দিতেও রাজি। তারা তাঁর নামে একটি বাজে কথাও সহ্য করতে পারে না। এ নির্মল ভালোবাসা ও আবেগের উৎস বুঝতে হলে, এর কারণ জানতে হলে, একজন

অমুসলিমকে মুসলিম হয়েই তা বুঝতে হবে। এর একটা অন্যতম কারণ হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নাম, তাঁর কাহিনি, শিক্ষা, পছন্দ আর অপছন্দ মুসলিমদের ঘরে ঘরে প্রতিনিয়ত আলোচিত হয় এবং তাঁর প্রতিটি বিষয়কে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে মূল্যায়ন করা হয়।

গোটা পৃথিবীতে 'মুহাম্মাদ' নামটি সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত। তবে অনেকেরই অজানা যে, মুহাম্মাদ নামের মানুষদের সাধারণত অন্য কোনো নামে ডাকা হয়। ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিমদের মধ্যে এ প্রচলন সবচেয়ে বেশি। এর কারণ, মানুষ মনে করে বাচ্চাকে বকাঝকা কিংবা ডাকাডাকি করার সময় এ নামের অসম্মান হতে পারে। এমনকি শুধু 'মুহাম্মাদ' নামে ডাকাকেও একটি অসম্মানের বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। উপমহাদেশীয় মুসলিমদের কাছে আরবদের এ অভ্যাসটি খুবই আপত্তিকর ও অস্বাভাবিক বলে মনে হয় যে, তারা অপরিচিত কাউকে 'হে মুহাম্মাদ' বলে সম্বোধন করে। এভাবে ডাকা তাদের পছন্দ না। এটা তাদের কাছে বেয়াদবি মনে হয়। অন্যদিকে আরবদের কাছে বিষয়টি সম্মানজনক। কেননা, মহিমান্বিত নাম 'মুহাম্মাদ' ডাকার মাধ্যমে ঐ ব্যক্তিকে উম্মতে মুহাম্মদী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি অসম্মান দেখানোর কিছু নেই।

মানব ইতিহাসে সম্ভবত আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ-ই একমাত্র মানুষ, যাঁর গোটা জীবনী সম্পূর্ণ অবিকৃত ও ধারাবাহিকভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম ও তাবি'ঈগণ তাঁর ব্যক্তিগত জীবন, আচার-অভ্যাস, পছন্দ-অপছন্দ, চলন-বলন, পোশাক-পরিচ্ছদ ও আদেশ-নিষেধ-প্রেরণা থেকে শুরু করে তাঁর সার্বিক খুঁটিনাটির চিত্র সংরক্ষণ করেছেন। তাঁর বাণী হলো স্বয়ং ওয়াহী অথবা ওয়াহীর ব্যাখ্যা। লিপিবদ্ধ করা, মুখস্থ করা, শিক্ষা দেওয়া, পুনরাবৃত্তি করা এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপায় তথা মানা ও চর্চা করার মাধ্যমে রাসূল ﷺ-এর প্রত্যেকটি বাণীর সংরক্ষণ করা হয়েছে। তাঁর বিচার-ফায়সালাই হলো ইসলামী আইন। যুগের পর যুগ ধরে মুসলিমরা এ মহামূল্যবান তথ্য ভাণ্ডার থেকে উপকৃত হয়ে আসছে। তাদের সন্তান-সন্ততিকে রাসূল ﷺ-এর জীবন সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ ও বিস্তারিত শিক্ষা দিচ্ছে। রাসূলের অনুকরণ একটি ইবাদাহ। তাই মুসলিমরা গুরুত্বের সাথে তাঁর প্রতিটি আদবকে রক্ষা করে চলেছে।

জীবনের প্রতিটি কথা ও কাজে মুহাম্মাদ ﷺ-কে অনুসরণ করাকে স্বয়ং আল্লাহ ﷻ তাঁর ভালোবাসা লাভের শর্ত করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, কেউ যদি রাসূল ﷺ-কে অনুকরণ ও অনুসরণ করে, তবে আল্লাহও তাকে ভালোবাসবেন। আল্লাহর ভালোবাসা প্রাপ্তির থেকে বড় চাওয়া-পাওয়া একজন মু'মিনের জন্য আর কী হতে পারে? আল্লাহ ﷻ বলেন,

'বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ করো, তাহলে আল্লাহও তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপগুলো মার্জনা করে দেবেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী, দয়ালু।' [সূরা আলে-ইমরান; ৩:৩১]

একারণেই মুসলিমরা রাসূল ﷺ-এর জীবনের খুঁটিনাটি সকল বিষয় সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয়। তারা বিশ্বাস করে যে, এ ছোটছোট কাজগুলোও অত্যন্ত বরকতপূর্ণ। তাই তারা নিজেদের জীবনে সেগুলো পালনে আগ্রহী হয়। লেখা-পড়া, সেমিনার, দার্স, হালাকা থেকে শুরু করে সম্ভাব্য সকল উপায়ে মুসলিমরা মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবনী সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করে। সে মহামানবের জন্মলগ্ন ও তার পূর্বের সামাজিক অবস্থা, তাঁর পিতা-মাতা, পূর্বপুরুষ, গোত্র ও পরিবার প্রভৃতি সম্বন্ধে আমরা জানতে পারি। তাঁর শৈশবকালের ঘটনাগুলোও আন্তরিকভাবে মনোযোগ সহকারে শুনি। নবুওয়্যাত লাভের পূর্বে তাঁর যৌবনকাল, বেড়ে ওঠা, পরিণত বয়সের চমৎকার ঘটনাগুলো আমাদের পাঠ থেকে বাদ পড়ে না।

শামে তাঁর ব্যবসায়িক ভ্রমণ, খাদিজা رضي الله عنها-এর সাথে বিবাহ এবং সংসার জীবন সম্পর্কেও আমরা জানতে পারি। তাঁর যে চরিত্র, আখলাক, বিশ্বস্ততা তাঁকে "আস-সাদীক্ব-উল-আমীন" উপাধি এনে দিয়েছিলো সে সম্বন্ধে শিখি। আমরা তাঁর চিন্তাশীলতা ও প্রজ্ঞা থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করি। শির্ক, কলুষতা ও অন্যায়ের মাঝে ডুবে থাকা মানুষের জন্য তাঁর উদ্বেগ দেখতে পাই। গুহায় বসে তাঁর ধ্যান, প্রথম ওয়াহী লাভের ঘটনা এবং নবুয়্যাতের দিকে তাঁর আহ্বান সম্পর্কে জানতে পাই। এরপর আমরা দেখতে পাই, তাঁর নবুয়্যাত-পরবর্তী জীবন। নবুয়্যাতের পূর্বে যারা তাঁকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতো, সমাজের সেসব মানুষগুলোই পরবর্তীতে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, নিপীড়ন নিগৃহীত করেছিল। প্রবল বিরোধিতার মুখে অবিচল থাকা কাকে বলে, সে শিক্ষা আমরা তাঁর জীবন থেকেই লাভ করি।

আমরা দেখতে পাই, দীর্ঘ তের বছর যাবৎ মক্কায় নিজ গোত্রের আপনজনদের হাতে রাসূল ﷺ এবং সাহাবাগণ কী পরিমাণ নির্যাতন-নিপীড়ন, বয়কট, অবরোধ এবং আক্রোশের শিকার হয়েছিলেন! শেষ পর্যন্ত তাঁকে জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে মদীনায় হিজরত করতে হয়েছিল। একই বছর পর পর নবী ﷺ-এর প্রধানতম দুই সহযোগী, প্রিয় স্ত্রী খাদিজা رضي الله عنها এবং তাঁর চাচা আবু তালিব মৃত্যুবরণ করেন। বছরটি তাঁর জন্য এতই দুঃখ-কষ্টের ছিলো যে, একে বলা হয় 'আম-আল-হুযন (দুঃখের বছর)। মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় তাঁর সংগ্রাম এবং পৃথিবীর ইতিহাসের প্রথম সংবিধান 'মদীনা সনদ' তৈরি করতে গিয়ে তিনি যে দূরদৃষ্টি ও প্রজ্ঞা দেখিয়েছেন আমরা তা স্মরণ করি। আমরা দেখেছি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সে সনদে তিনি সকলের সমান অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছেন। প্রশাসন, প্রতিরক্ষা ও জাতিকে গড়ে তোলার যে নিয়ম-নীতি ও পদ্ধতি তিনি প্রণয়ন করেছেন সে সম্পর্কে জানতে পারি। এর মধ্যে সবচেয়ে চমৎকার যে জিনিসটি আমরা দেখি তা হলো 'মুসলিম উম্মাহ' গঠন—ঈমানের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা ভ্রাতৃত্ববোধ। এ গোষ্ঠীর মধ্যে এমন এক মজবুত ভ্রাতৃত্ব গড়ে ওঠেছিল যা এ পৃথিবীর মানুষ এর পূর্বে বা পরে কখনো দেখেনি। এ ছিল এমন এক মহান ভ্রাতৃত্ব যা বহু বছরের শত্রু গোত্রের মাঝে মৈত্রীর বন্ধন সৃষ্টি করেছিল। তারা তাদের পূর্ববর্তী প্রজন্মের রক্তপাতের প্রতিশোধ না নিয়ে পরস্পরকে ক্ষমা করে দেয়।

সীরাহ পড়ে আমরা জানতে পারি, শত্রুরা ইসলাম প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে কী জঘন্য ষড়যন্ত্র করেছিল। যুদ্ধের ময়দানে প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর আহত হওয়ার ইতিহাস আমরা জানি। আরো জানি, সেসব মহান সাহাবায়ে কেরামের কথা যারা ঈমানকে রক্ষা করতে গিয়ে শহীদ হয়েছিলেন। আমরা জানতে পারি, মুনাফিকরা ভেতরে থেকেও কীভাবে তাঁর অকল্যাণ সাধনের চেষ্টা করেছিল। আমরা মদীনায় তাঁকে দেখি একাধারে রাষ্ট্রনায়ক, শাসক, সেনাপতি, স্বামী ও পিতার চরিত্রে। এছাড়াও একজন সাধারণ গৃহকর্তার মতো তিনি নিজ ঘর গুছিয়ে রেখেছেন, নিজের বাসন নিজে পরিষ্কার করছেন এবং পরিবারকে ঘরের কাজে সাহায্য করেছেন! শিক্ষক, ইমাম, বিচারক এবং সঙ্গীরূপে তাঁর ভূমিকাও আমরা জানতে পারি। সবকিছুতে তিনি ছিলেন এক অনন্য ব্যক্তিত্ব।

আমরা দেখি, তাঁর অনুসারীরা তাঁকে কী পরিমাণ শ্রদ্ধা ও সম্মান করেছেন! নিজেরা ছোট হয়েছেন, তবুও আল্লাহর রাসূলকে কখনো অপদস্থ হতে দেননি।

ভালোবাসার মূল ভিত্তি হচ্ছে জানা ও মানা। আপনি যাকে চেনেন না, যাকে জানেন না, সত্যিকার অর্থে তাকে কখনোই ভালোবাসতে পারবেন না। আপনি যখন একজন ভালো মানুষ সম্পর্কে জানবেন, তখন তাঁর সম্পর্কে আরও জানতে আগ্রহী হবেন। ফলে তাঁর আরও অনেক ভালো ভালো দিক আপনার সামনে উন্মোচিত হবে। এতে সে মানুষটির প্রতি আপনার ভালোবাসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। এজন্যই মুসলিমরা নিজেদের জীবনকে মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবনের আদলে সাজাতে তাঁর জীবনী নিয়মিত অধ্যয়ন করে।

তিনি ছিলেন এ পৃথিবীর বুকে আসা শ্রেষ্ঠ মানুষ। যদি বলা হয় যে, অধিকাংশ মুসলিমরা তাদের পিতৃপুরুষদের চেয়ে মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবন সম্পর্কে বেশি জানে—তাহলে মোটেই বাড়িয়ে বলা হবে না। আমি আমার নিজের জীবন থেকেই এটা বলতে পারি। আমার বাবা এবং দাদা উভয়েই মারা গিয়েছেন। তাদের শৈশব, যৌবন, পরিবারের সাথে কাটানো অন্তরঙ্গ মুহূর্ত, তাদের পাওয়া না পাওয়া স্বপ্ন এবং আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে যদি আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তবে খুব বেশি হলে কিছু ভাসাভাসা বর্ণনা দিতে পারব।

আমি নিশ্চিত যে, অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রেই এ কথাটি প্রযোজ্য। কারণ, পূর্বপুরুষদের কাহিনী নিয়ে কথা বলার প্রচলন এখন আর নেই। আমাদের অবস্থা এমন যে, আমাদের যেদিন জন্ম, পৃথিবীও যেন সেদিনই সৃষ্টি হয়েছে। তাই মৃত্যুর সাথে সাথে আমাদের কথাও মানুষ ভুলে যায়। কিন্তু সে একই প্রশ্নগুলো মুহাম্মাদ ﷺ-এর ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞেস করুন। আমি প্রত্যেকটির বিস্তারিত লিখিত বর্ণনা দিতে পারব। আমি নিশ্চিতভাবে দাবি করতে পারি যে, যেকোনো মুসলিম পরিবারে তাদের পূর্বপুরুষদের চেয়ে মুহাম্মাদ ﷺ-এর নাম বেশি উচ্চারিত হয়। এর মানে এ নয় যে, মুসলিমরা তাদের পূর্বপুরুষদের ভালোবাসে না; বরং তারা তাদের চেয়েও মুহাম্মাদ ﷺ-কে বেশি ভালোবাসে।

ছোট ছোট প্রতিটি কাজেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অনুসরণ করার গভীর তাৎপর্য ও বরকত আছে। তাই মুসলিমরা গোসল, ইস্তিনজা, নখ কাটা, চুলের ভাঁজ, দাড়ি, জামা-কাপড়, পানাহার, পোশাক, জুতো পরা-খোলা এবং ঘুমোতে

যাওয়া কিংবা ঘুম থেকে ওঠার মতো দৈনন্দিন সাধারণ বিষয়েও মুহাম্মাদ ﷺ-কে অনুসরণ করে। এ ধরনের অসংখ্য প্রাত্যহিক কাজের খুঁটিনাটি সুন্নাহও সংরক্ষিত আছে। মুসলিমরা অত্যন্ত গর্বের সাথে এ সুন্নাহগুলো শেখে এবং চর্চা করে। খুব সাধারণ কোনো কাজও রাসূলুল্লাহ ﷺ কীভাবে করেছিলেন সেটা জানা ও মানার চেষ্টা করাও মুসলিমদের জন্য খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহ যতো বেশি অনুসরণ করে, মুসলিমরা তাঁকে ততো বেশি সম্মান করে এবং সে আল্লাহর কাছে ততোধিক প্রিয় বান্দা হয়।

একজন মুসলিম অপর একজন মুসলিম ভাইকে দাঁড়িয়ে পানি পান করতে দেখলে স্বাভাবিকভাবেই বলেন, 'প্লিজ বসে পান করুন।' তিনিও বিনা প্রশ্নে সেটা মেনে নেন। কারণ তিনি জানেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ বসে পানি পান করতেন। কেউ অন্য কারও ওপর রেগে গিয়ে চিৎকার করলে তাকে বলা হয় যে, 'এমন ব্যবহার সুন্নাহর পরিপন্থী। প্লিজ উত্তেজিত হবেন না, আস্তে কথা বলুন।' গোটা বিশ্বজুড়ে সকল মুসলিমের জন্য মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবনাচরণ হলো শিরোধার্য এক অপরিবর্তনীয় রেফারেন্স।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর করা দু'আগুলো অতি যত্ন সহকারে মুসলিম বাচ্চাদের শিক্ষা দেওয়া হয়। তিনি যেভাবে আল্লাহর কাছে দু'আ করতেন, তারাও সেভাবে দু'আ করে। তাঁর বরকতময় জীবনের বিভিন্ন কাহিনী শুনে তারা বিস্মিত হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনের কঠিন মুহূর্তগুলোর বর্ণনা শুনলে মুসলিমদের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়। আবার তাঁর বিজয়গাথা শুনে এত বেশি খুশি ও আপ্লুত হয় যেন ঘটনাগুলো তাদের চোখের সামনে ঘটছে। যখন উম্মাহর জন্য তাঁর আত্মত্যাগের কথা শোনে তখন মুসলিমরা নিজেদেরকে সৌভাগ্যবান মনে করে এবং তাঁকে আরও বেশি ভালোবাসতে থাকে। অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রেই, বিশেষ করে এ যুগের নেতাদের ক্ষেত্রে, 'ঘনিষ্ঠতা ঘৃণার জন্ম দেয়' প্রবাদটি খুব মানানসই। আপনি এদেরকে যতো কাছ থেকে দেখবেন, এদের প্রতি ততো ঘৃণা জন্মাবে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ উল্টো। আপনি তাঁর সম্পর্কে যতই জানবেন, ততোই তাঁকে ভালোবাসবেন।

রাসূল ﷺ-এর জীবনে আমাদের শিক্ষা গ্রহণের মতো গৌরবময়, উৎসাহ-অনুপ্রেরণা দায়ক, বিনয়সূচক ও চ্যালেঞ্জিং ঘটনার কোনো অভাব নেই। আপনার কোনো মহৎ পরিকল্পনায় যদি কারও থেকে কোনো সমর্থন না পান তবে

মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবনী পড়ুন। আপনি যদি প্রবল প্রতিকূল অবস্থার বিপরীতে সাফল্য লাভ করে খুব বেশি গর্ব বোধ করতে চান, তবে মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবনী পড়ুন। ন্যায়ের পথে দাঁড়াতে গিয়ে যদি বাধা-বিপত্তির কারণে ব্যর্থ হওয়ার ভয় করেন, যদি নিজের জীবন ও স্বাধীনতা হরণের হুমকির আশঙ্কা করেন, তাহলে মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবনী পড়ুন। আপনি যদি শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে হতোদ্যম কিংবা ভীত হয়ে পড়েন, তবে মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবনী পড়ুন। তাঁর জীবন হলো এমন এক আলো যা সমগ্র মানবজাতিকে সবসময় পথ দেখায়। এজন্যই আল্লাহ ﷻ রাসূল ﷺ-এর জীবনকে সর্বোত্তম অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। আল্লাহ ﷻ বলেন,

'যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম উপমা রয়েছে।' [সূরা আল আহ্যাব; ৩৩:২১]

এ বার্তাটুকুই মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর উম্মাহ ও সমগ্র বিশ্বের কাছে উপস্থাপন করেছেন। এ আয়াতটি আমাদেরকে আমাদের সৃষ্টিকর্তার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। আমাদের আমন্ত্রণ জানায় একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করতে। কেননা, ইবাদাতের যোগ্য সত্তা কেবল তিনিই। এ আয়াত আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, একদিন আমাদের সবাইকে আল্লাহর সামনে একত্রিত হতে হবে। রাসূল ﷺ মানুষকে বিচার দিবসের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন; উপদেশ দিয়েছেন যেন আমরা হই ন্যায়পরায়ণ, নীতিবান, দায়িত্বশীল, সত্যবাদী, সদয় এবং দানশীল। ভালো কাজ করার মাধ্যমে মহা বিচারের দিনটির জন্য যেন প্রস্তুতি গ্রহণ করি। আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো কিছুর ইবাদাত করা কিংবা তাঁর সাথে অন্য কারও শরীক করার ব্যাপারে তিনি আমাদেরকে কঠোরভাবে সাবধান করে দিয়েছেন।

সকল প্রকার যুলুম, পাপাচার, অন্যায়-অবিচার থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন। বিশেষত সমাজের সেসব দুর্বল অসহায় জনগোষ্ঠীর প্রতি আচার ব্যবহারের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে যারা সচরাচর অন্যায়-অবিচারের শিকার হয়, যেমন-ইয়াতীম এবং বিধবা। তিনি মানুষকে কথা ও কাজে সীমালঙ্ঘন করার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। তিনি মানুষকে আদেশ করেছেন সদাচরণ এবং ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ গঠনে; যেখানে মানুষের শাসন নয়, বরং আল্লাহর আইনের শাসন থাকবে। তিনি এসব কথা মুখে বলেই

ক্ষান্ত হননি, এগুলোর বাস্তব প্রয়োগ করেও দেখিয়ে দিয়েছেন। তাঁর দেখিয়ে দেওয়া এ পথেই মুসলিমদের চলতে হবে কিয়ামত পর্যন্ত। কেউ যদি জানতে চায় শরী'য়াহ আইন কিভাবে মেনে চলতে হবে, উত্তর হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মতো করে। তিনিই ইসলামের মানদণ্ড। তেইশ বছরের সুদীর্ঘ সময়ে তিনি একটি অভূতপূর্ব সমাজ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করে গিয়েছেন। ইতিহাস তার সাক্ষী। তিনি সে সমাজে হাতে-কলমে ইসলামী আইনের বাস্তব প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন। তাই কখনোই একথা বলার সুযোগ নেই যে, ইসলাম এ যুগে অচল। স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে ইসলামই হলো একমাত্র কল্যাণকর শাশ্বত সমাজ ব্যবস্থা। অতীতের মতো এ ব্যবস্থাই হলো বিশ্বমানবতার একমাত্র মুক্তিসনদ। সে যুগে শরী'য়াহ আইনের অধীনে মানুষের মাঝে যে শান্তি, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য ছিলো তা আবারও ফিরিয়ে আনা সম্ভব। এ কারণেই আল্লাহ তাঁর মহিমান্বিত রাসূল সম্পর্কে বলেছেন,

'আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি সালাত প্রেরণ করেন। হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর ওপর দরুদ প্রেরণ করো এবং তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ করো।' [সূরা আল আহযাব; ৩৩:৫৬]

আমরা আমাদের নেতা ও ইমাম মুহাম্মাদ ইবন আবদিল্লাহ ﷺ-এর প্রতি অন্তরের অন্তস্তল থেকে সম্মান জানাই। দু'আ করি, যেন আল্লাহ তাঁকে সর্বোচ্চ পুরস্কারে পুরস্কৃত করেন। দু'আ করি যেন তাঁকে বিচার দিবসে মাক্বাম-আল-মাহমুদের সর্বোচ্চ আসনে আসীন করা হয় এবং তাঁকে যেন তাঁর উম্মতের জন্য শাফা'আতের সুযোগ দেওয়া হয়। আমরা আল্লাহর কাছে আরও দু'আ করি, যেন আমরা তাঁর শাফা'আত লাভের সৌভাগ্য অর্জন করি এবং ক্ষমাপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি।

রাসূল ও উম্মাহ সম্পর্কে বাচ্চাদের সচেতনতা

বাচ্চাদের জানাতে হবে যে, রাসূলকে বাদ দিয়ে কখনোই আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক গড়ে ওঠতে পারে না। রাসূল ﷺ-এর আনীত বার্তার মাধ্যমেই আমরা

আল্লাহকে চিনেছি। এমনকি আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার একমাত্র প্রমাণই হলো তাঁর রাসূলের অনুসরণ। কেননা আল্লাহ ﷻ বলেছেন,

‘বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ করো, তাহলে আল্লাহও তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপগুলো ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাশীল, দয়ালু।’ [সূরা আ-লে ইমরান; ৩:৩১]

আপনার শিশুকে শেখান—আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসা এবং আল্লাহর পথে সংগ্রাম করা হলো ঈমানের শর্ত এবং অন্য যেকোন কিছু থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ; এমনকি নিজের পিতা-মাতা, পরিবার ও সম্পদের প্রতি ভালোবাসা থেকেও বেশি। কেননা আল্লাহ ﷻ বলেছেন,

‘বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা মন্দা হয়ে যাওয়ার ভয় করো এবং তোমাদের বাসস্থান যাকে তোমরা পছন্দ করো—এগুলো যদি আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা করো আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত। আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।’ [সূরা আত তাওবা; ৯:২৪]

রাসূল ﷺ-এর প্রকৃত মর্যাদা এবং আমাদের সাথে তাঁর সম্পর্ক, আমাদের ওপর তাঁর অধিকার এবং তাঁর প্রতি আমাদের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে শিশুদের শিক্ষা দিন। আল্লাহ ﷻ রাসূল ﷺ-এর মর্যাদাকে সমুন্নত করেছেন এবং মুসলিমদেরকে আদেশ করেছেন তাঁর ওপর সালাত ও সালাম পাঠ করতে। কুরআনে আল্লাহ বলেছেন,

‘আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি সালাত প্রেরণ করেন। হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর ওপর দরুদ প্রেরণ করো এবং তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ করো।’ [সূরা আল আহ্যাব; ৩৩:৫৬]

রাসূলের আনুগত্য করাকে আল্লাহ ﷻ ঈমানের একটি শর্ত হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। তিনি বলেন,

‘তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক হিসেবে মেনে নেয়। অতঃপর তোমার

মীমাংসার ব্যাপারে নিজেদের মনে কোনো রকম সংকীর্ণতা অনুভব না করে এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেয়।’ [সূরা আন নিসা; ৪:৬৫]

আল্লাহ পৃথিবীর সকল মুসলিমদের এক জাতি হিসেবে অভিহিত করেছেন এবং আরও বলেছেন, মুসলিমরা একে অপরের ভাই। তাদেরকে সম্মানিত করেছেন। এ সম্মানের মূলভিত্তি হলো, তারা কেবল এক আল্লাহর ইবাদাত করে। তিনি বলেন,

‘তোমাদের এ উম্মত তো একই উম্মত, আর আমিই তোমাদের পালনকর্তা; অতএব কেবল আমারই ইবাদাত করো।’ [সূরা আল আম্বিয়া; ২১:৯২]

‘তোমাদের এ জাতি তো একই জাতি, আর আমিই তোমাদের প্রভু; অতএব আমাকে ভয় করো।’ [সূরা আল মু’মিনুন; ২৩:৫২]

মুসলিম শিশুদেরকে এমনভাবে বড় করতে হবে যেন তারা তাদের দ্বীনি ভাই-বোনদেরকে অন্যদের ওপর প্রাধান্য দিতে শেখে। তাদের মধ্যে যেন এমন একটি সার্বজনীন ও বৈশ্বিক ভ্রাতৃত্ববোধ জন্ম নেয় যার ভিত্তি হলো ঈমান; যা জাতি, ভাষা, বর্ণসহ সকল সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে।

শিশুরা চোখ দিয়ে শোনে

শিশু যেন এমন পরিবেশ পায় যেখানে সে দেখবে—তার বাবা-মায়ের জীবন ও তাদের প্রত্যেকটি ইচ্ছে হলো আল্লাহর ইচ্ছে ও মুহাম্মাদ ﷺ-এর আনীত দ্বীনের অনুবর্তী। তাদের হৃদয়পটে আল্লাহর ভয় ছাড়া আর কারও ভয় থাকবে না। সে দেখবে তার পিতা-মাতা আল্লাহর কাছে নিজেদের সঁপে দিয়ে সুখী বোধ করছেন। যথাসম্ভব আল্লাহর ইবাদাতে নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখছেন। সে যেন বাবা-মায়ের চেহারায় সালাহ আদায়ের সময় পরম ভক্তি ও একাগ্রতার ছাপ দেখতে পায়। এর মাধ্যমে সে আল্লাহর সাথে নিজের গভীর সম্পর্ক অনুভব করতে শিখবে। কুরআন শুনে শুনে তার মনে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা জন্ম নেবে। কুরআনের কথাগুলো বোঝার আকাঙ্ক্ষা জাগবে। কুরআনের ভাষা না বুঝলেও তা শুনে শুনে সে তার হৃদয়ে ভয় ও ভালোবাসা অনুভব করবে। ‘আল্লাহ’ নামটি তার কাছে এমন কিছু হবে না যা কেবল গৎবাঁধা কিছু

ইবাদাতের সময় মাথায় আসে। বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর নাম তার সামনে বারবার উচ্চারণ করতে হবে। দিনের সব কাজকর্মে আল্লাহ এবং রাসূলকে জীবন-ঘনিষ্ঠরূপে উপস্থাপন করতে হবে। যেন এর ফলে তাঁরা তার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়। আল্লাহ ﷻ বলেন,

'আল্লাহ যার বক্ষ ইসলাম গ্রহণের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, অতঃপর সে তার রবের পক্ষ থেকে আগত নূরের ওপর রয়েছে। আর যাদের অন্তর আল্লাহকে স্মরণের ব্যাপারে কঠোর, তাদের জন্য দুর্ভোগ; তারা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে রয়েছে।' [সূরা আয যুমার; ৩৯:২২]

তাদের মনে স্মৃতির সঞ্চার করে দিন। এমন স্মৃতি যা কঠিন সময়ে তাদেরকে শক্তি যোগাবে, যে স্মৃতি তাদেরকে দুঃখ-কষ্টের সময়ে অবিচল রাখবে, যে স্মৃতি অন্ধকারে তাদেরকে আলোর পথ দেখাবে।

একটি মুসলিম শিশুকে যদি সঠিকভাবে বড় করা হয় তবে সে অবশ্যই কুরআন শেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠবে; কেননা, সে তার বাবা-মা'কে অতি তারতিল সহকারে তা পাঠ করতে দেখেছে। সে যেন আপনাকে চিনতে পারে আপনার তিলাওয়াত শুনে, তাহাজ্জুদে আপনার কিরাতের সুর শুনে। আপনার দু'আর ক্ষমতা দেখে যা সে আপনার ও তার নিজের জীবনে অনুভব করেছে। এবং এটা দেখে যে, জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ আপনি নিয়েছেন এ প্রশ্নের ভিত্তিতে—'আল্লাহ এতে খুশি হবেন তো?' সে যেন বুঝতে পারে যে—সন্দেহজনক এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টির সাথে সম্পৃক্ত প্রতিটি বিষয়কে আপনি পরিত্যাগ করেছেন। এমন হলে আপনার শিশুকে জোর করে কিছুই শেখাতে হবে না। সে নিজে থেকেই আগ্রহী হয়ে ওঠবে দ্বীনের প্রতি। বাচ্চারা অনুকরণ প্রিয়। তারা বড়দের যা কিছু মূল্যায়ন করতে দেখে, নিজেরাও সেগুলোর মূল্যায়ন করে এবং সেগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। তারা যদি দেখে বড়রা টাকাকেই বড় করে দেখছে, তাহলে তারাও তেমনটাই করবে। তারা যদি দেখে বড়রা আল্লাহ ও রাসূলের সুন্নাহকে মূল্যায়ন করছে, তবে তারাও তা-ই শিখবে। যদি তারা দেখে তাদের পিতা-মাতা নিজেদের স্বার্থের কারণে ইসলামের বিধি-বিধানকে নিজেদের সুবিধামতো বদলে দিচ্ছে, ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে পালন করছে কিংবা অমান্য করছে, অথবা যুক্তির আড়ালে জায়েয করে নিচ্ছে

নিজেদের ইসলাম বিমুখ আচরণকে; তাহলে সন্তানও এসব ভণ্ডামিকে জায়েয মনে করবে। মুখে মুখে নিজেকে মুসলিম দাবি করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করতে তখন তাদেরও গায়ে লাগবে না। কিন্তু তারা যদি বিপরীতটি দেখে; তবে সবকিছুকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে শিখবে। পৃথিবীকে তার স্থানে রেখে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করবে। আর গোটা পৃথিবীর স্রষ্টা যিনি প্রশ্নাতীতভাবে সকলের ভালোবাসা ও আনুগত্য লাভের যোগ্য সত্তা, সেই মহান আল্লাহকে সঠিক স্থানে বসিয়ে তাঁর মূল্যায়ন করতে শিখবে। তাই তাকে সর্বপ্রথম আল্লাহর সাথেই সম্পর্ক গড়ে তুলতে দিন।

একবার এক ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল—কিভাবে চার থেকে সাত বছর বয়সী বাচ্চাদের ইসলাম সম্পর্কে অভিনব উপায়ে শিক্ষা দেওয়া যায়, যা তার মন-মননে সৃষ্টিকর্তার মহত্ব ও বড়ত্ব উপলব্ধি করতে সাহায্য করবে?

আমি বলেছিলাম—শিশুদের মনকে আল্লাহর মহত্ত্ব উপলব্ধি করানোর সবচেয়ে উত্তম উপায় হলো আল্লাহর সৃষ্টিকে তাদের সামনে উপস্থাপন করা। কোনো বিষয়ের ওপর ধারণা দিয়ে সেটির ওপর বাচ্চাদের একটি ছোট্ট প্রজেক্ট ধরিয়ে দিন। যেমন: ওদের একটি প্রকাণ্ড গাছের কাছে নিয়ে যান, সেটি ঘুরে ফিরে দেখতে দিন, এর বিশালতা অনুভব করতে দিন। তারপর ওদের সে গাছের বীজগুলো দেখিয়ে বলুন, 'তোমরা কি জানো—এ বিশাল গাছটির জন্ম এ ছোট্ট বীজ থেকে? তোমরা কি জানো কিভাবে তা হয়েছে?' এরপর ওদের কিছু বলতে উৎসাহিত করুন। উত্তরটি জানিয়ে দেওয়া বা ওদের ভুল সংশোধন করা এখানে মূল উদ্দেশ্য নয়। বরং এভাবে তাদের কল্পনার দ্বারকে উন্মুক্ত করতে দিন। রঙ পেন্সিল আর খাতা ধরিয়ে দিন তাদের হাতে। বীজের ভেতরে গাছটি কেমন করে আছে তা কল্পনা করতে বলুন এবং কল্পনাকে আঁকতে দিন। তাদের জিজ্ঞেস করুন, 'আচ্ছা বলতো, এ গাছটি বীজের ভেতর থেকে আল্লাহকে কী বলছে?' তাদের বলতে দিন, বলতে দিন এবং বলতে দিতে থাকুন।

তারপর ওদেরকে বলুন, একই গাছ থেকে এমন দু'টো পাতা নিয়ে আসতে যেগুলো পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ওরা এমন কিছু খুঁজে পাবে না। তারপর ওদেরকে জিজ্ঞেস করুন, 'আচ্ছা পাতাগুলো তো একই গাছের তাই না?' ওরা বলবে, হ্যাঁ। পুনরায় প্রশ্ন করুন, 'পাতাগুলো তো অনেকটা একই রকম তাই

না?' ওরা বলবে, হ্যাঁ। আবার প্রতিটি পাতা একটি অন্যটি থেকে ভিন্ন, কোনোটা হুবহু অন্যটার মতো নয়, তাই না? বলো তো, 'আল্লাহ কেন এমনভাবে মিলের মধ্যে অমিল সৃষ্টি করলেন?' এরপর ওদেরকে ভাবতে দিন...।

তারপর তাদেরকে বলুন, তারা যেন এবার নিজেদের দিকে লক্ষ্য করে এবং নিজেদের মধ্যে পার্থক্যগুলো খুঁজে বের করে। তবে তারা একে অন্যকে তাচ্ছিল্য করতে পারবে না; বরং সম্মানবোধ নিয়ে যেন কাজটি করে। এরপর তাদেরকে আগের মতো এ পার্থক্যের কারণ জিজ্ঞেস করুন।

তারপর তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, 'ধরো দু'জন শিল্পী আছে, একজন একটি ছবি এঁকে তার একশটি কপি বানায়। আরেকজন একশ এক রকমের ভিন্ন ভিন্ন ছবি আঁকে। তাদের মধ্যে কে বড় শিল্পী? আর কেনই বা সে বড়?'

তারপর তাদের সবার আঙ্গুলের ছাপ নিন এবং বলুন, 'তোমাদের প্রত্যেকের আঙ্গুলের ছাপ ভিন্ন। শুধু তাই নয়, কারও সাথেই তোমাদের আঙ্গুলের ছাপ মিলবে না। তোমরা কি জানো, তোমাদের জন্মের আগে ঠিক এমন আঙ্গুলের ছাপ কারও ছিল না, আবার তোমরা দুনিয়া ছেড়ে চলে যাওয়ার পরও কখনোই হুবহু এমন আঙ্গুলের ছাপ কারও হাতেই পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ এটা কেবলই তোমার। হুবহু তোমার মতো আঙ্গুলের ছাপ কারও কোনো দিন ছিল না; কারও কোনো দিন থাকবেও না।'

এখন তোমরা বল, 'যে মহান সত্তা এমন নিখুঁত সুন্দর ও অদ্বিতীয় করে এ আঙ্গুলের ছাপ সৃষ্টি করেছেন, তাঁর ব্যাপারে তোমাদের কী ধারণা? কে এ মহান সত্তা?' যদি আপনি এভাবে তাদেরকে ভালোভাবে বিষয়টি শেখাতে পারেন, তাহলে তারা এতোটাই মুগ্ধ হবে যে, তারা সারাজীবন এ বিষয়টা মনে রাখবে।

বস্তুত, আল্লাহই আমাদের শিখিয়েছেন যেন আমরা তাঁর পরিচয় এভাবে উপস্থাপন করি, যখন তিনি কুরআনের প্রথম নাযিলকৃত আয়াতে বলেছেন,

'পড়ুন, আপনার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।' [সূরা আলাক; ৯৬:১]

বিষয়টি ভেবে দেখুন—আল্লাহ বলছেন পড়ো, কিন্তু কী পড়তে বলেছেন? আল্লাহ যা পড়তে আদেশ করেছেন তা হলো আল্লাহর সৃষ্টি। তিনি বলেছেন

সৃষ্টির মাঝে আল্লাহর নিদর্শনসমূহের সন্ধান করতে। ঠিক এ পদ্ধতিটি আমি অবলম্বন করছি। আল্লাহর মহত্ত্বকে চেনার সবচেয়ে উত্তম উপায় হলো ঈমানের চোখ নিয়ে তাঁর সৃষ্টিসমূহের দিকে দৃষ্টিপাত করা।

আমাদের সমস্যা হলো আমরা বাচ্চাদের তারবিয়্যাহ শিক্ষা দিতে অনেক দেরি করে ফেলি। যখন তারা ছোট থাকে তখন আমরা উদ্বিগ্ন থাকি, কখন তারা বড় হবে। আর যখন তারা বড় হয়ে যায়, তখন তাদেরকে নিয়ে আমরা আর ভাবি না। আমরা মনে করি, কেবল ছোটবেলায়ই বাচ্চাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। আর তাদের ঘিরে যে ব্যস্ততা তা-ও হলো কেবল খাবার-দাবার, পোশাক-আশাক আর সুস্থ থাকা নিয়ে। তাদের হাত থেকে নিস্তার পেতে আমরা তাদেরকে টিভি সেটের সামনে বসিয়ে দেই কিংবা ভিডিও গেম ধরিয়ে দেই। এটা আরো খারাপ। এমন না করে যদি আমরা তাদের জন্য একান্ত কিছুটা সময় আলাদা করে দিতাম এবং তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতাম, দ্বীনের সৌন্দর্য তাদের সামনে ফুটিয়ে তুলতাম; তবে তারা এমন সন্তানে পরিণত হতো যাদের নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারতাম।

আল্লাহর অফুরন্ত ভাণ্ডারের সন্ধান: সালাহ ও দু'আ

আল্লাহর সাথে যখন একটি শিশুর সম্পর্ক দৃঢ় হয়, তখন তার সকল প্রয়োজন পূরণের জন্য সে কেবল আল্লাহর মুখাপেক্ষী হতে শেখে। আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা ও অন্যদের কাছে সাহায্য চাওয়া থেকে সে বিরত থাকতে শেখে। শিশুরা যখন জানতে পারে যে, আল্লাহর অফুরন্ত ভাণ্ডারের চাবি হলো সালাহ, তখন সে অবশ্যই যেকোনো বিপদাপদের সময়ে আল্লাহর কাছে সালাতের মাধ্যমেই সাহায্য চাইতে শেখে এবং তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করতে থাকবে। আল্লাহ ﷻ বলেন,

'তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ রাখবো এবং আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো; অকৃতজ্ঞ হইও না।' [সূরা আল বাকারা; ২:১৫২]

বাচ্চাদের শেখাতে হবে যে, গভীর রাতে কীভাবে সালাতে দণ্ডায়মান হয়ে আল্লাহর রহমতের অশেষ ভাণ্ডার থেকে চেয়ে নিতে হয়। এর মাধ্যমে বাচ্চারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের সুযোগ পাবে এবং আল্লাহও তাদের ডাকে সাড়া দেবেন। কেননা আল্লাহ ﷻ বলেছেন,

'আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে, বস্তুতঃ আমি রয়েছি একান্ত কাছেই। যখন প্রার্থনাকারীরা প্রার্থনা করে, তখন তাদের প্রার্থনায় সাড়া দেই। কাজেই তাদের উচিত আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা; যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে।' [সূরা বাকারা; ২:১৮৬]

এভাবে একটি সন্তান 'ইহসান'-এর অর্থ বুঝতে পারে। 'ইহসান' হলো এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত করা যেন তাঁকে আমরা দেখছি; আর তা সম্ভব না হলে অন্তত এতটুকু মনে করতে হবে যে, তিনি আমাদেরকে দেখছেন।

আল্লাহকে তখন তার কাছে অনেক বাস্তব বলে মনে হবে এবং রাসূল ﷺ হবেন তার সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিত্ব। সে তখন রাসূলের সুন্নাহ অনুসরণ করার গুরুত্ব বুঝবে এবং জানবে যে, এ সুন্নাহই হলো শক্তি ও কল্যাণের উৎস। কেননা, আল্লাহকে ভালোবাসার প্রমাণ দিতে হয় রাসূলের সুন্নাহকে অনুসরণ করার মাধ্যমেই। শিশুরা এভাবে আল্লাহর রাসূলকে ভালোবাসতে শিখবে এবং তাঁর উম্মত হিসেবে নিজে গর্ববোধ করবে। সে নিজেই তখন বুঝতে শিখবে—তার পরিচয় হলো সে একজন মুসলিম, সে মুহাম্মাদ ﷺ-এর উম্মাত। মানুষের তৈরি করা জাতীয়তাবাদের ঊর্ধ্বে ওঠে সে ইসলামী সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের স্বাদ আস্বাদন করতে শিখবে। সে নিজেকে আবিষ্কার করবে এক বৃহৎ পরিসরে, এক বিশাল পরিবারের সদস্য রূপে; যার ভিত্তি হলো মুসলিম ভ্রাতৃত্ব। এ ভ্রাতৃত্বের সূচনা করেছিলেন রাসূল ﷺ নিজে। স্বয়ং আল্লাহ এ ভ্রাতৃত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং এ বোধটাকে ইবাদাত হিসেবে গণ্য করেছেন।

দান ও দা’ওয়াহ: মানবতার প্রতি অবদান রাখা

সর্বশ্রেণীর, বিশেষ করে উচ্চবিত্ত পরিবারের শিশুদেরকে কাজের মূল্য বোঝাতে হবে। তাদের মধ্যে কষ্ট সহ্য করার মানসিকতা তৈরি করতে হবে। তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে, ফ্রিজ ভর্তি খাবার, নরম বিছানা, আর যা চাই তা-ই পাওয়া অনেকের কাছে শুধুই স্বপ্ন। কারণ জীবনে কখনো এগুলো ভোগ করার সৌভাগ্য তাদের হয়নি। অনেক মানুষ এসব ছাড়াই তাদের সারা জীবন কাটিয়ে দেয়। অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া, সৎ কাজ করা, সৎ সাহস রাখা এবং নিজের কাজ নিজে করার ব্যাপারে সন্তানদেরকে উৎসাহিত করতে হবে। অন্যদের সাথে নিজের জিনিস ভাগাভাগি করে নেওয়ার আনন্দ তাদের বোঝাতে হবে। কোনো অসহায় একজন মানুষকে কিছু দেওয়ার পর তার চোখে-মুখে ভীষণ আনন্দের যে আভা উদ্ভাসিত হয় তা উপভোগ করা শেখাতে হবে। যে কখনো কিছু পাওয়ার আশা করেনি, তাকে কিছু দেওয়ার আনন্দের সাথে কোনো কিছুরই তুলনা হয় না। নিজের প্রয়োজন নেই এমন কিছু অন্যকে দিয়ে দেওয়াটা ভালো; কিন্তু অন্যের প্রয়োজনে নিজের একান্ত পছন্দের জিনিষটি দিয়ে দেওয়াটা আরও অনেক বেশি প্রশংসনীয়—এ বোধ তাদের মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে। কারণ এতে অন্যের প্রতি তার আন্তরিক মমত্ববোধ ফুটে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ, শিশু-কিশোরদের কাছে ‘সময়’ খুবই প্রিয় জিনিস। সে যখন বৃদ্ধদের সাথে স্বেচ্ছায় সময় কাটায় তখন তার কিছু সময় তাদেরকে সে দিয়ে দেয়, যদিওবা এর কোনো আর্থিক মূল্য নেই। এ ধরনের কাজে তাদেরকে উৎসাহ দিতে হবে। বয়োজ্যেষ্ঠদের সাথে কথা বলে সে কী শিখতে পেরেছে তা নিয়ে আলাপচারিতার মাধ্যমে বাবা-মা সন্তানদেরকে এ কাজে উৎসাহ দিতে পারে। যখন তারা দান করার মাঝে আনন্দ খুঁজে পাবে তখনই কেবল তাদের দান করার মানসিকতা গড়ে ওঠবে।

দান করা একটি ক্ষমতা, যা কেবল সম্পদশালীদেরই দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সম্পত্তি ব্যক্তির নিজের নয়, বরং তা অন্যদের আমানত মাত্র। তাদের প্রয়োজন হলেই তা দিয়ে দিতে হবে, যদিও দান করা বা না করার ক্ষমতাটা তাদেরকে দেওয়া হয়েছে। তাই যারা অন্যদের কথা না ভেবে একাই সবকিছু ভোগ করে তারা আসলে সে আমানতের খিয়ানত করছে; এবং এর জন্য তাদেরকে একদিন জবাবদিহি করতে হবে। এটাই হলো আমানতের মূলকথা এবং তা ইসলামের একটি মৌলিক চেতনা। আমাদের ঈমানও আমানত। এ আমানতকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। ঠিক তেমনি, আমাদের কাছে গচ্ছিত সম্পদের আমানতও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যের কল্যাণে ব্যয় করতে হবে। মুসলিম শিশুদেরকে শেখাতে হবে যে, আল্লাহর বিচারের মাপকাঠি হচ্ছে একমাত্র তাক্‌ওয়া। আমাদের ধন-সম্পদ আসলে আমাদের জন্য পরীক্ষা মাত্র। তিনি দেখতে চান, আমরা সেগুলো কী কাজে ব্যয় করি। আল্লাহ ﷻ বলেন,

‘হে মানবজাতি, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অন্যকে চিনতে পারো। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক মুত্তাকী। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন।’ [সূরা আল হুজুরাত; ৪৯:১৩]

তাদেরকে শেখান অমূল্য সে শ্রেষ্ঠতম বিনিয়োগের কথা—যে বিনিয়োগ আল্লাহর সাথে, আল্লাহর পথে। এ এমন এক বিনিয়োগ, যার লাভ চলতে থাকে জীবন ভর। মৃত্যুর পরেও এ লাভের খাতা খোলাই থাকে। তাদেরকে শিক্ষা দিন যে, এ বিনিয়োগ দুনিয়ার অন্য যেকোনো ব্যবসা থেকে উত্তম ও লাভজনক। এ লাভের হার দশগুণ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত হতে পারে! আর সবশেষে এ কথা বলতেই হয়, এ বিনিয়োগে ক্ষতি বা হারানোর কোনো ভয় নেই। কেননা, স্বয়ং আল্লাহ এ বিনিয়োগের উত্তম প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এর থেকে বড় প্রাপ্তির নিশ্চয়তা আর কী হতে পারে? কত চমৎকারভাবেই না আল্লাহ ﷻ বলেছেন,

‘এমন কে আছে যে আল্লাহকে ঋণ দেবে; উত্তম ঋণ? অতঃপর আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ-বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেবেন। তিনিই সংকুচিত করেন এবং তিনিই প্রশস্ততা দান করেন এবং তাঁরই নিকট তোমরা সবাই ফিরে যাবে।’ [সূরা আল বাকারা; ২:২৪৫]

সবশেষে, খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্ব হলো মানুষের কাছে ইসলাম প্রচার করা। আপনি নিজে দাওয়াত দিন এবং সে দৃষ্টান্তের মাধ্যমে শিশুদের নিকট দাওয়াহ্‌র গুরুত্ব ও দাওয়াহ্‌র সঠিক উপায়টি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন। কেবল মৌখিক দাওয়াহ্ নয় বরং নিজে কাজটি করার মাধ্যমে দাওয়াহ্‌র গুরুত্ব সন্তানদের বোঝাতে হবে। ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে ও আত্মবিশ্বাসের সাথে মেনে চলার শিক্ষা তাদেরকে দিন। খুঁটিনাটি সবকিছুতেই তা মেনে চলতে হবে; যেমন, পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-আচরণ, লেনদেন, কথা ও কাজ যা-ই কিছু হোক না কেন। এটা মাথায় রাখতে হবে যে, অন্যেরা তাদেরকে দেখে শিখবে এবং যদি তারা তাদের মাঝে ভালো কিছু দেখে এবং তাদেরকে পছন্দ করে, তাহলে তারা ইসলামের নিকটবর্তী হবে। বাচ্চাদেরকে ভদ্র ও দয়ালু হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। তারা যেন হাসি-খুশি ও অমায়িক ব্যক্তিত্বে পরিণত হতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

আরেকটা ব্যাপার তাদের অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যে, আল্লাহর ব্যাপারে কারও সাথে আলোচনা করতে চাইলে শুরুতেই তার অন্তরকে জয় করে নিতে হবে। মানুষ যদি আপনাকে পছন্দ না-ই করে তবে তারা স্বভাবতই আপনার মুখে ধর্মের কথা শুনতে আগ্রহী হবে না। কেননা, মানুষের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা হলো—তারা ধর্মকে ধর্ম অনুশীলনকারীর সাথে মেলায়; হয় উভয়কেই গ্রহণ করে, নতুবা উভয়কেই বর্জন করে। তাই বাচ্চাদের সাথে যথেষ্ট পরিমাণ সময় কাটাতে হবে এবং তাদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষা প্রদানের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

যদি একটি সন্তান তার নিজের ধর্ম সম্পর্কে সঠিকভাবে না জানে, তবে কি করে সে অন্যদেরকে তার নিজ ধর্মের প্রতি আহ্বান করবে? আমরা দেখি যে, মুসলিম অভিভাবকগণ বাচ্চাদেরকে দুনিয়াবী শিক্ষা দানের জন্য বিশাল অঙ্কের টাকা খরচ করছেন, অথচ ধর্মীয় শিক্ষাকে একটা অযাচিত উপদ্রব ভাবছেন। তাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র লজ্জারও উদ্রেক হয় না, যখন তাদের সন্তান শুদ্ধভাবে কুরআন পড়তে পারে না কিংবা ঠিকমতো সালাহ আদায় করতে পারে না।

হেদায়েত মিলবে কেবল সঠিক ও শাশ্বত জ্ঞানের পথ ধরে; আর পিতা-মাতার প্রাথমিক দায়িত্ব হলো তাদের সন্তানদেরকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত

করে গড়ে তোলা। এ ব্যাপারে তারাই একমাত্র দায়িত্বশীল ও জবাবদিহির আওতাধীন। তাদেরকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে। এ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে। অনেক সময় পেরিয়ে গিয়েছে। বাবা-মায়ের উচিত এখনি এ ব্যাপারে মনোযোগী হওয়া।